দুঃখের বরষায়

দুঃখের বরষায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য ১৸০

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বী হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কল্যাণীয়—

শ্রীমান্ মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী আশা দেবী

মেসোমশাই

দুঃখের বরষায়

১

বৈশাখ মাস। বৈকাল বেলা। গা ধুইয়া বেশভূষা সারিয়া পুষ্পিতা আসিয়া প্রকাণ্ড বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল পথের পানে। পথে গাড়ী-ঘোড়া চলিয়াছে। লোকজন চলিয়াছে। তাদের পিছন হইতে আকাশ জুড়িয়া ওদিক হইতে প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ দু' হাতে কালির তুলি বুলাইয়া হু-হু বেগে আগাইয়া আসিতেছে...

রাজ্যের কাক-চিল আতঙ্কে কলরব তুলিয়া মাথার উপর দিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া চলিয়াছে···নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে!

দোতলার ঘরে সহসা টেলিফোন বাজিল। সে-শব্দে পুষ্পিতার মন তার অজ্ঞাতে কেমন চমকিয়া উঠিল।···

এই নিঃশব্দ-নির্জ্জনতা ভালো লাগিতেছিল। এ নির্জ্জনতার মধ্যে আবার বাহিরের ডাক? অস্বস্তি না ধরিল, এমন নয়!

পুষ্পিতা রিশিভার ধরিল, কহিল—হ্যালো...

উত্তর মিলিল,—পুষ্পিতা!...এসেচো!...হ্যাঁ, আমি নীলাদ্রি!... সুখপর আছে। টেলিগ্রাম এসেছে। প্রিভি-কাউন্সিলের মকর্দ্দমায় আমার জিত হয়েছে···বাড়ীতে আজ রাত্রে ছোট্ট পার্টির ব্যবস্থা করেছি...যেতে পারিনি বলে মাপ করো...কিন্তু তোমার আসা চাই...নিশ্চয়...না এলে আমার বড় দুঃখ হবে...বুঝলে!...আসচো তো?

পুষ্পিতা কহিল,—Congratulations ! কিন্তু আসা হবে না। বাবা এখনো ফেরেননি···বেলা সেই দশটায় বেরিয়েছেন...এমন ভাবনা হচ্ছে !

নীলাদ্রি জবাব দিল—কাজের জন্য কোথাও আট্‌কে পড়েচেন নিশ্চয়। ভাবনা কিসের ?···তাছাড়া পার্টির এখনো দু' ঘণ্টা সময় বাকী···রাত আটটা···বুঝলে ! শুধু near-and-dear ones যাঁরা, তাঁরাই আসচেন...বুঝলে, আসা চাই। না, কোনো excuse আমি শুনবো না। না...না...না···। আমি এখন মার্কেটে যাচ্ছি। পারি যদি, তোমার গুখান হয়ে ফিরবো।

নীলাদ্রি টেলিফোন রাখিয়া দিল।

পুষ্পিতা সেখানে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, নিস্পন্দ পুতুলের মতো···

তারপর আবার আসিল গাড়ী-বারান্দায়...

ইহারি মধ্যে আকাশের চেহারা কালোয় কালো হইয়া গিয়াছে। তুলার পাঁজের মতো যেখানে যেটুকু সাদা মেঘ ছিল, সেখানে কালো মেঘ আসিয়া আস্তানা পাতিয়া বসিয়াছে। রণজিৎ সিঙের সেই গল্প পুষ্পিতার মনে পড়িল—সব লাল হো যায়েগা ! আকাশ তেমনি এক নিমেষে কালোয় কালো।

নীচে বাহিরের দিকে পিতার কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

পিতা শিবশঙ্কর ডাকিলেন—কালো···

কালো বহুদিনের খানশামা। শিবশঙ্করের আহ্বানে সে কহিল, —যাই...

গাড়ী-বারান্দায় পুষ্পিতা আগ্রহে অধীর···শিবশঙ্কর আসিয়া কি সংবাদ দিবেন !

শিবশঙ্কর আসিলেন না। পুষ্পিতা কাঠ হইয়া রহিল।

—আমার ভালো লাগছে না। যেতে ইচ্ছা করছে না···

শিবশঙ্কর কহিলেন,—সে কি! সে অত-বড় মকৰ্দ্দমা জিতেছে... তার মানে, জানো?

পুষ্পিতা কোনো জবাব দিল না, শিবশঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবশঙ্কর কহিলেন—কম্‌সে কম প্রায় দু' তিন লাখ টাকার মালিক হলো নীলু...তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা উচিত নয়?

পুষ্পিতা কহিল—অসদ্ভাব তো আমার কোনো দিনই নেই।

শিবশঙ্কর কহিল—জানি। তবু আজকের এ ব্যাপারে...বিশেষ, ওর যখন এত আগ্রহ...তুমি যাওনি বলে গাড়ী পাঠাচ্ছে...এতখানি খাতির-যত্ন করে...বুঝচো না...?

পুষ্পিতা কহিল—কিন্তু আমার মনের অবস্থা আজ নিমন্ত্রণে যাবার তো নয়, বাবা। সেখানে হট্টগোল চলেছে দারুণ...

শিবশঙ্কর বুঝাইলেন —না, না, তা হয় না, মা।··· বিশেষ, আমার মনে যে-সাধ চিরদিন আছে···

পুষ্পিতা দুই চোখের তীক্ষ্ণ অবিচল দৃষ্টি মেলিয়া শিবশঙ্করের পানে রহিল···সে দৃষ্টির সামনে শিবশঙ্কর এতটুকু হইয়া গেলেন! কথাটা বলা চলিবে না। সদ্য দুর্দ্দশা-দুর্গতির আবর্ত্তে পড়িয়া মনে লোভ জাগিয়াছে, তাই মেয়ে পাঠাইয়া...

ধিক্কারে মন ভরিয়া গেল।

একটা নিশ্বাস রোধ করিয়া তিনি বলিলেন—তা নয় মা···মানে, আমি বললুম কি না, তুমি যাবে···তাকে আমাদের এ বিপদের কথা বলবো কেন? কাকেও বলবো না···। কেউ না জানে, হুঁশিয়ার থাকবো···যত দিন পারি। এ দুর্দ্দশা সহ্য হবে মা...কিন্তু কেউ যদি করুণা করতে আসে, সে-করুণা সইতে পারবো না।···তাই সব দিক

পুষ্পিতা কহিল,—Congratulations ! কিন্তু আসা হবে না। বাব
এখনো ফেরেননি···বেলা সেই দশটায় বেরিয়েছেন...এমন ভাবন
হচ্ছে !

নীলাদ্রি জবাব দিল—কাজের জন্য কোথাও আট্‌কে পড়েচে
নিশ্চয়। ভাবনা কিসের ?···তাছাড়া পার্টির এখনো দু' ঘণ্টা সময়
বাকী···রাত আটটা···বুঝলে ! শুধু near-and-dear ones যাঁরা,
তাঁরাই আসচেন...বুঝলে, আসা চাই। না, কোনো excuse আমি
শুনবো না। না...না...না···। আমি এখন মার্কেটে যাচ্ছি। পারি যদি,
তোমার গুখান হয়ে ফিরবো।

নীলাদ্রি টেলিফোন রাখিয়া দিল।

পুষ্পিতা সেখানে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, নিস্পন্দ পুতুলের মতো···

তারপর আবার আসিল গাড়ী-বারান্দায়...

ইহারি মধ্যে আকাশের চেহারা কালোয় কালো হইয়া গিয়াছে।
তুলার পাঁজের মতো যেখানে যেটুকু সাদা মেঘ ছিল, সেখানে কালো
মেঘ আসিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে। রণজিৎ সিঙের সেই গল্প
পুষ্পিতার মনে পড়িল—সব লাল হো যায়েগা ! আকাশ তেমনি এক
নিমেষে কালোয় কালো।

নীচে বাহিরের দিকে পিতার কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

পিতা শিবশঙ্কর ডাকিলেন—কালো···

কালো বহুদিনের খানশামা। শিবশঙ্করের আহ্বানে সে কহিল,
—যাই...

গাড়ী-বারান্দায় পুষ্পিতা আগ্রহে অধীর···শিবশঙ্কর আসিয়া কি
সংবাদ দিবেন !

শিবশঙ্কর আসিলেন না। পুষ্পিতা কাঠ হইয়া রহিল।

নীলাদ্রি বলিল—পুষ্পিতা আসবে না কাকাবাবু ?

শিবশঙ্করের চেতনা ফিরিল।...পুষ্পিতা নিশ্চয় আসিবে ! ...আজ নিরুপায় অসহায়···যেন সাহারার বুকে পড়িয়া আছেন...সঙ্গে ডাগর মেয়ে পুষ্পিতা ! তিনি একা হইলে কোনো দুঃখ ছিল না। কিন্তু ডাগর মেয়ে পুষ্পিতা...তার বিবাহ দিতে গেলে...এ দারিদ্র্যে সব-চেয়ে দুর্ভাবনা আজ পুষ্পিতাকে লইয়া। এ যুগে পয়সা নহিলে মেয়ের বিবাহ হইবে না, তা সে মেয়ে যত রূপসী হোক, যত লেখাপড়া শিখুক, গানে-বাজনায় কথায়-বার্তায় যতই তার পটুতা থাকুক ! নীলাদ্রির সঙ্গে পুষ্পিতার ভাব ছেলেবেলা হইতে। সেই নীলাদ্রি আজ লক্ষপতি ! সেই নীলাদ্রি যদি আজ···

তিনি কহিলেন,—হ্যাঁ। পুষ্পিতা যাবে বৈ কি !·· আমি তাকে বলছি। এই ঝড়-বৃষ্টির জন্য বোধ হয় যেতে পারেনি।

নীলাদ্রি বলিল – আপনার শোফার আছে তো ?

কথাটা শিবশঙ্করের বুকে লাগিল তপ্ত লোহার মতো ! ... গাড়ী ও শোফার বিদায় লইয়াছে আজ দশ দিন। নীলাদ্রি ... আমা ঠিক, সে তো বহুদিন এ বাড়ীতে আসে নাই। নিজের মামলা-মকর্দ্দমা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিল। সে জানে না, শিবশঙ্করের অদৃষ্ট ফাট্ ধরিয়া সে-ফাট বাড়িয়া তাঁর ভাগ্যকে আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির করিয়া দিয়াছে !

না। এ খপর নীলাদ্রির না জানা ভালো। তাঁর সব গিয়াছে, এ খপর শুনিলে সেও দুনিয়ার বিধি মানিয়া তাঁর সঙ্গে হয়তো সব সম্পর্ক কাটিয়া দিবে ! নীলাদ্রির কাছে এ সংবাদ গোপন রাখিতে হইবে··· অন্ততঃ তত দিন, যত দিন না···মনে যে-কল্পনা জাগিয়াছে, সে কল্পনা সত্য হইয়া ওঠে !

শিবশঙ্কর বলিলেন,—গাড়ীখানা সারাতে দিয়েছি কি না...তাই হয়েছে মুস্কিল! তা পুষিকে আমি কালোর সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে পাঠিয়ে দিতে পারি!

নীলাদ্রি কহিল,—না কাকাবাবু···ট্যাক্সি নয়। আমি এখান থেকে গাড়ী পাঠাচ্ছি। গাড়ী এখনি যাবে। আপনি তাকে তৈরী থাকতে বলুন···

—আচ্ছা...

টেলিফোন ছাড়িয়া শিবশঙ্কর আসিয়া সোফায় বসিলেন। খোলা খড়খড়ি দিয়া জলের হাওয়া ঘরে আসিতেছিল...সে হাওয়ার স্পর্শে প্রাণ কেমন উদাস হইয়া ওঠে! ওদিকে কোন্ গৃহে রেডিও-শেট্ খুলিয়াছে। গান হইতেছে—

তুই মিছে আকুল হোস্ না!
ও মন, রাতের পরে আসে রে দিন,
অমার পরে জোস্না!

শিবশঙ্করের মনে হইল, এ গান যেন তাঁকে লক্ষ্য করিয়া গাওয়া হইতেছে। চারিদিকে...কি ঘন অন্ধকার···জমাট-কালো অন্ধকার! এ অন্ধকার কাটিবে? দুরাশা মনে হইতেছিল। তাই বুঝি, এ-গান তাঁকে সান্ত্বনা দিতেছে,—রাতের পরে আসিবে দিন, অমার পরে জোস্না...

নীলাদ্রির কথা মনে হইল। নীলাদ্রিকে জানেন তার ছোট বেলা থেকে। ছেলেটি ভালো। তাঁকে ভক্তি করে। পুষির সঙ্গে খুব ভাব। বলতে গেলে, খেলায়-ধূলায় দুজনে একসঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে। নীলাদ্রির হাতে যদি পুষিকে সমর্পণ করা যায়...পুষ্পিতার সম্বন্ধে যেমন তাঁর দুশ্চিন্তা থাকিবে না, তেমনি এ দুর্দ্দিনে হয়তো তাঁরো কি

সুবিধা হইতে পারে! ভিক্ষা নয়—ধার লইয়া সে-টাকায় যদি এ
ব্যবসা খুলিয়া বসেন...? তারপর..

হায় মানুষের মন, পড়িয়া তখনি সে উঠিয়া দাঁড়াইতে চায়
ধরিয়া! ছায়া সত্য নয়...ছায়া—এ কথা মনে থাকে না!...

সহসা মনে পড়িল, এ কী চিন্তা করিতেছেন! পুষ্পিতা
লইতে গাড়ী আসিতেছে···নীলাদ্রির এ-সৌভাগ্যে পুষ্পিতা যদি সেখা
গিয়া না দাঁড়ায়·· তাঁর কি মুখ থাকিবে এ কল্পনা ভাষায় প্রকাশ করি
কোনো দিন নীলাদ্রিকে বলিবার?...

শিবশঙ্কর ডাকলেন—পুষি···মা···

নীচে হইতে পুষ্পিতা কহিল—ভাজা হয়ে গেছে বাবা। খিচুড়ী
নামলেই আমি আসছি...

কি তুচ্ছ খিচুড়ী লইয়া মেয়ে ভাবিয়া আকুল! হুঁঃ...

শিবশঙ্কর কহিলেন,—খিচুড়ী থাকুক মা···কালো দেখবে'খ
একবার উপরে এসো। দরকার আছে···

শিবশঙ্কর দাঁড়াইয়া রহিলেন দোতলার সিঁড়ির উপর···

নীচে রান্নাঘরে কালোকে খিচুড়ী সম্বন্ধে পুষ্পিতা উপদেশ দিতেছি
কালো বলিল,—তুমি এখন যাও দিদি···তোমার কাছে আমাকে
রান্না শিখতে হবে? হয়েছে আর কি!

পুষ্পিতা উপরে আসিল; আসিয়া কহিল—ডাকচো কেন?

শিবশঙ্কর কহিলেন—নীলু এই মাত্র টেলিফোন করছিল, তার ওখ
তোমার যাবার কথা ছিল···তুমি যাওনি বলে সে গাড়ী পাঠাচ্ছে।
তৈরী হয়ে নাও...গাড়ী এখনি এসে পৌছুবে।

পুষ্পিতা কহিল—কিন্তু আমি যাবো না বাবা...

শিবশঙ্কর কহিলেন—কেন?

আমার ভালো লাগছে না। যেতে ইচ্ছা করছে না···

বশঙ্কর কহিলেন,—সে কি! সে অত-বড় মকর্দ্দমা জিতেছে... মানে, জানো?

পুষ্পিতা কোনো জবাব দিল না, শিবশঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবশঙ্কর কহিলেন—কমসে কম প্রায় দু' তিন লাখ টাকার মালিক া নীলু...তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা উচিত নয়?

পুষ্পিতা কহিল—অসদ্ভাব তো আমার কোনো দিনই নেই।

শিবশঙ্কর কহিল—জানি। তবু আজকের এ ব্যাপারে...বিশেষ, । যখন এত আগ্রহ...তুমি যাওনি বলে গাড়ী পাঠাচ্ছে...এতখানি তির-যত্ন করে...বুঝচো না...?

পুষ্পিতা কহিল—কিন্তু আমার মনের অবস্থা আজ নিমন্ত্রণে যাবার তো নয়, বাবা। সেখানে হট্টগোল চলেছে দারুণ...

শিবশঙ্কর বুঝাইলেন —না, না, তা হয় না, মা।··· বিশেষ, আমার নে যে-সাধ চিরদিন আছে···

পুষ্পিতা দুই চোখের তীক্ষ্ণ অবিচল দৃষ্টি মেলিয়া শিবশঙ্করের পানে হি...সে দৃষ্টির সামনে শিবশঙ্কর এতটুকু হইয়া গেলেন! কথাটা ন... না। সদ্য দুর্দ্দশা-দুর্গতির আবর্ত্তে পড়িয়া মনে লোভ ...য়াছে, তাই মেয়ে পাঠাইয়া...

ধিক্কারে মন ভরিয়া গেল।

একটা নিশ্বাস রোধ করিয়া তিনি বলিলেন—তা নয় মা···মানে, মি বললুম কি না, তুমি যাবে···তাকে আমাদের এ বিপদের কথা বো কেন? কাকেও বলবো না···। কেউ না জানে, হুঁশিয়ার রবো···যত দিন পারি। এ দুর্দ্দশা সহ্য হবে মা...কিন্তু কেউ যদি ৃপা করতে আসে, সে-করুণা সইতে পারবো না।···তাই সব দিক

একটা ধর্ম্ম আছে তো। আর রান্না? ঐ কথাটাই কাঁটার মতো মনে বিঁধচে মা···আমি বলি, ও-ই রাঁধুক।···কায়স্থ? তাতে কি? বামুন-কায়স্থ, জাত-অজাতের বিচার করে তারা, যাদের মন ছোট।

পুষ্পিতা কহিল—আমি রাঁধবো বাবা।

বাপ শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—তুই রাঁধবি কি! পাগল! তার চেয়ে আমি বরং···। রাঁধতে জানি, মা। বাগানে ফিষ্ট্ হতো··· তখন আমার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর। আমি রাঁধতুম পোলাও, মাংস, চাটনি। যা রাঁধতুম, খেয়ে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেতো। তোর মা খেয়েছিলেন আমার হাতে রাঁধা চাট্‌নি ··বুঝ্‌লি, বেশী দিনের কথা নয়। তাঁর চলে যাবার আগেই।···তাছাড়া এ ব্যবস্থা কদিনের জন্যই বা? বড় জোর ছ'মাস।···যা ভেবেছি, তাতে তার বেশী সময় লাগবে না। মাসে পাঁচশো-সাতশো টাকা বেওজর হাতে আসবে।···লোকনাথ আছে। একদিন আমার দোরে পড়ে থাকতো। আমিই তাকে বলে-কয়ে গঙ্গাদাস বেণীমাধবের ফার্ম্মে ঢুকিয়ে দিছি···সে এখন পাটের কারবার করছে। আমাকে বলেছে,—আপনি আসবেন। আণ্ডার-ব্রোকারী-হিসাবে আমরা অনেক টাকা পাইয়ে দিতে পারবো'খন।...প্রথম দু'একমাস হয়তো তেমন কিছু পাবো না, কিন্তু আখেরে লাভ হবে···

পুষ্পিতা কহিল—আমি চাকরি করবো, বাবা,···বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখিয়েছো···

শিবশঙ্করের দু'চোখ কপালে উঠিল। তিনি কহিলেন,—তুই চাকরি করবি! স্বপ্নেও এমন কথা ভাবিস্ নে! তাহলে সমাজে আমার কি আর কোনো দিন মাথা তোলবার উপায় থাকবে?

পুষ্পিতা কহিল—অভাবের পাহাড় মাথায় চাপিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকলেই বুঝি মাথা উঁচু থাকবে?

শিবশঙ্কর কহিলেন,—তা নয় মা। কি চাকরি করবে তুমি, শুনি! ...ঙালীর মেয়ে হয়ে জন্মেচো...বনেদী ঘরের মেয়ে···এই বয়স···

বয়সের উল্লেখে পুষ্পিতার মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। মেয়েদের বয়সের পিছনে কতখানি আশঙ্কা, কতখানি সংশয় পুঞ্জিত থাকে··· বিশেষ বাঙালীর ঘরে মেয়ে-জন্ম লইলে...পুষ্পিতার মন সতেজে রুখিয়া উঠিল।

সে বলিল,—না, আমি কোনো কথা শুনবো না। আমি চাকরি করবো, এতে তুমি রাগই করো, আর যাই করো···

বাহিরে তখনো প্রবল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে···ঝড়ের মাতন এতটুকু কমে নাই।

শিবশঙ্কর বলিলেন—কিছু টাকা আছে। এগুলো রেখে দে মা।

একটা লেফাফার মধ্যে ছিল ক'খানা দশ-টাকার নোট। পুষ্পিতার হাতে শিবশঙ্কর লেফাফা দিলেন। পুষ্পিতা আলমারি খুলিয়া নোটের তাড়া তুলিয়া রাখিল।

কালো আসিল। শিবশঙ্কর কহিলেন—এ বৃষ্টিতে আর রান্নাবান্না করে না। দোকান থেকে লুচি-তরকারী কিনে আন্। তাই খাওয়া যাবে।

পুষ্পিতা কহিল—না, কালোদা। তুমি উনুনে আগুন দাও। আমি রাঁধবো।

কালো হাসিল, হাসিয়া বলিল—কি রাঁধবে দিদি, শুনি?

পুষ্পিতা কহিল—খিচুড়ী।

কালো বলিল—কি দিয়ে খিচুড়ী রাঁধে, বালো তা দিদি?

পুষ্পিতা কহিল—আমাকে এমন আহাম্মক মনে করো না কালোদা। রাঁধতে জানি না? আচ্ছা, দ্যাখো কি রকম রাঁধি। খাবার আগে সমালোচনা করা উচিত নয়।

কালো বলিল—বেশ, বেশ, তুমি রাঁধো।...কতগুলি চাল, কতগুলি ডাল বার করে দেবো বলো তো?

পুষ্পিতা কহিল—ঐটে তুমি শুধু বলে দিয়ো। বাকী ভার রইলো আমার।

শিবশঙ্কর কহিলেন—তুই রাঁধতে বসলে শেষে একটা অগ্নি-কাণ্ড করবি, দেখছি! ...যে রকম সময় যাচ্ছে, বিচিত্র নয়!

পুষ্পিতা কহিল—না বাবা, তুমি বারণ করো না, সত্যি। আমাকে যে-রকম পুতুল ভাবো, আমি সে-রকম নই। যখন পয়সা ছিল, তখন নবাবী করেছি। এখন পয়সা নেই, সংসারের কাজ করতে হবে।

৩

রাত্রি সাড়ে আটটা। ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে।

টেলিফোনে সাড়া জাগিল। পুষ্পিতা একতলার রান্না-ঘরে। বিছানায় পড়িয়া শিবশঙ্কর আকাশ-পাতাল অনেক কথা ভাবিতেছিলেন। টেলিফোন বাজিতে উঠিয়া রিশিভার ধরলেন, কহিলেন,—ইয়েশ,

উত্তর আসিল—আমি নীলাদ্রি। পুষ্পিতা আছে?

শিবশঙ্কর বলিলেন—একটু কাজে ব্যস্ত আছে...

নীলাদ্রি বলিল,—ও! কাকাবাবু?

শিবশঙ্করকে নীলাদ্রি 'কাকাবাবু' বলিয়া ডাকে। নীলাদ্রির বাবা হিমাদ্রির সঙ্গে শিবশঙ্করের ছিল বন্ধুত্ব।

শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন—হ্যাঁ।

নীলাদ্রি বলিল—প্রিভি-কাউন্সিলের আপীলে আমি জিতেছি কাকাবাবু। সেজন্য বাড়ীতে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি... পুষ্পিতাকে বলেছিলুম আসবার জন্য...

শিবশঙ্কর নির্ব্বাক রহিলেন... প্রিভি-কাউন্সিলের আপীলে হিমাদ্রি জিতিয়াছে! তার মানে, তার মামার অগাধ বিষয়-সম্পত্তির সে মালিক হইয়াছে! সম্পত্তি সামান্য নয়—মফঃস্বলে প্রকাণ্ড জমিদারী; তাছাড়া কোম্পানির কাগজ, কলিকাতা সহরে চার-পাঁচখানা বাড়ী। একখানা বাড়ী আবার পার্ক ষ্ট্রীটে! ওঃ...

চোখের সামনে তিনি দেখিতেছিলেন, একদিকে এক প্রাসাদ-ভবনের খিড়কী-পথে নতশিরে দীন বেশে মা লক্ষ্মীর প্রস্থান, ওদিকে আলো-বাজনায় প্রচণ্ড সমারোহ তুলিয়া আর-একজনের গৃহে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া তাঁর প্রবেশ! কথায় বলে, চঞ্চলা চপলা লক্ষ্মী!

একটা নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে তীরের মতো ছুটিয়া বাহির হইল

মেয়েকে শিবশঙ্কর বুকের উপর টানিয়া লইলেন,—পুষ্পিতার দু' চোখে অশ্রু নাই...সুখ-দুঃখের অনুভূতি বুক হইতে সব উবিয়া গিয়াছে !

শিবশঙ্কর কহিলেন—একটা সুবিধা হয়েছে এই যে উদ্বেগের ভাব কেটেছে ! নিশ্চিন্ত মনে জীবনটাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারবো ।

নূতন করিয়া জীবন গড়িয়া তোলা ?...

হায়, এ বয়সে তাহার সুযোগ বা সম্ভাবনা কোন্ দিক দিয়া কি করিয়া হইবে ?

শিবশঙ্কর তাহা বোঝেন,—বুঝিলেও আশা ছাড়িতে পারেন না ! এ-আশা ছাড়িলে কি লইয়া থাকিবেন ?

পুষ্পিতা আপনাকে পিতার বাহু-পাশ হইতে মুক্ত করিল,—করিয়া মেঝের উপর বসিল ।

শিবশঙ্কর কহিলেন—তুই কাতর হোস্‌নে মা...তুই কাতর হলে কার মুখ চেয়ে আমি দাঁড়াবো বল্ ? ...

পুষ্পিতার মাথার কেশ পুষ্প-সুরভিত...বেশ-ভূষায় বিলাসের দীপ্তি ! পুষ্পিতার দেহে-মনে সেগুলা যেন উপহাসের কাঁটা বিঁধিতেছিল !

একে-একে সব ঘুচিতে বসিয়াছে...বেশে-ভূষায় আহারে-বিহারে আরামে-বিরামে ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন হইতেছিল !...যেটা যায়, সেটা আর সংগ্রহ করা যায় না ! পিতা বলেন—তোর পাউডার ফুরিয়ে গেছে, বলিস্ নি কেন মা ? কাল এনে দেবো...মনে করিয়ে দিস্...

পুষ্পিতা শাড়ী পরিয়াছে নিত্য নূতন...এখন সে শাড়ীতে তালি পড়িয়াছে। সেমিজের হাতায় লেশগুলা ছিঁড়িয়া গিয়াছে...বুকের কাছে সেলাই দিয়া অঙ্গের আবরু পুষ্পিতা রক্ষা করিতেছে ।

হু-হু বেগে ঝড়, সেই সঙ্গে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা…পৃথিবীতে যেন প্রলয় জাগিল!

পুষ্পিতা আসিয়া ঘরে বসিল।…

খোলা জানলা-খড়খড়ি-দরজাগুলা দুম-দাম শব্দে আছড়া-পিছড়ি খাইতেছে…প্রলয়ের সঙ্গে যেন দুরন্ত সংগ্রাম বাধিয়াছে! ঝড় চায় তাদের উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে,—তারাও তাই প্রাণপণে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছে!

শিবশঙ্কর উপরে আসিলেন, ডাকিলেন,—পুষি…

শিবশঙ্করের জামা-কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। মুখের যা ভাব, দেখিয়া পুষ্পিতা শিহরিয়া উঠিল। শিবশঙ্কর একটা সোফায় বসিয়া পড়িলেন।

বাপের পাশে আসিয়া পুষ্পিতা কহিল—কি হলো?

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিবশঙ্কর কহিলেন—যা হবার,… তাই…

পুষ্পিতা বাপের পানে চাহিয়া রহিল। বাপের মুখে কালো ছায়া। সে ছায়ায় নিরুপায়তা মাখানো রহিয়াছে!

শিবশঙ্কর কহিলেন,—বাড়ীর জন্য সময় মিললো না…বিক্রী হয়ে গেল! যে কিনেছে, তার প্রাণে দয়া আছে,—ছ' মাস সময় দেছে—বাড়ীতে থাকতে। তারপর…

প্রকাণ্ড নিশ্বাসে কথার শেষাংশ উড়িয়া গেল।…

পুষ্পিতা খাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে প্রচণ্ড বায়ু গর্জ্জিয়া উঠিতেছে…বুকে যত জল আছে, নিঃশেষে সে-জল ঢালিয়া আকাশ বুঝি পৃথিবী জুড়িয়া মহাসাগর রচিয়া তুলিবে!

শিবশঙ্কর কহিলেন—কাছে আয় মা…

২

শিবশঙ্কর বলিলেন,—তোমার মায়ের কথা আজ মনে হচ্ছে। সতীলক্ষ্মী,…তাই তাঁকে এ দুঃখ সইতে হলো না। এ-দুঃখ যে তিনি সইলেন না, এতে কি আরাম বোধ করছি! মনে হচ্ছে, তাঁর উপর ভগবানের দয়া ছিল, তাই আগে থেকে ভগবান তাঁকে ডেকে নিয়েছেন।…আমি সব সইতে পারবো…তুইও আমার পানে চেয়ে একটু সহ্য কর্ মা…

শিবশঙ্করের দু'চোখ জলে ভরিয়া কণ্ঠের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

পুষ্পিতা কহিল,—কেঁদো না বাবা…কেঁদে কোনো ফল হবে না…

ইহার বেশী আর কোনো কথা সে বলিতে পারিল না।

একালের মেয়ে…সেন্টিমেন্টের উচ্ছ্বাস জানে না। সে উচ্ছ্বাসে তার বড় বিরাগ। মা নাই। মা বাঁচিয়া গিয়াছেন। সে কথা সত্য। কিন্তু…

অনেক কথা মনে জাগিতেছিল। কি প্রয়োজন ছিল এ ময়ূর-পুচ্ছ অঙ্গে আঁটিয়া পাঁচজনের তাক্ লাগাইয়া দিবার? যেদিন দুর্দ্দিনের প্রথম সূচনা জাগে, সেদিন হইতে কেন সতর্ক হও নাই? যে ছিদ্রে অনর্থের প্রবেশ, সে ছিদ্র আচারে-ব্যবহারে দিনের পর দিন এত বড় করিয়া যদি না তুলিতে! না তোলা…সে ছিল তোমারই হাতে।

এখন এ কান্না দেখিয়া লোকে হাসিবে, ঘৃণা করিবে! আহা বলি' কেহ একটু সমবেদনা প্রকাশ করিবে না!

শিবশঙ্কর বলিলেন—চাকর-বাকর নেই…তোমার কষ্ট হবে, জানি। কালো রইলো…ও মাইনে নেবে না…এমনি থাকবে। বলে, অনেক পয়সা খেয়েছি…যখন ছিল, মুঠো-মুঠো দেছ…এখন দিচ্ছো না…আমার

এ-সব শিবশঙ্করের চোখে পড়িয়াছে। শিহরিয়া শিবশঙ্কর বলিয়াছেন —শাড়ী-সেমিজ নেই, বলতে হয়!

পুষ্পিতা জানে, বলিয়া ফল নাই। যে-দামে শাড়ী-সেমিজ আসিবে, গৃহে সে-দামের আজ অভাব ঘটিয়াছে। বাপের মনে ব্যথা লাগিবে, তাই হাসিয়া পুষ্পিতা জবাব দিয়াছে,—গেল-ধোপে সাতটা সেমিজ কাচতে গেছে। তাই এ পুরোনো সেমিজটা বার করে পরেছি। সেমিজ আমার আছে। কিনতে হবে না, বাবা...

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছে...এত বড় দুর্দ্দিনের আশঙ্কা উদ্যত ছিল, তবু সে এতখানি আসন্ন, পুষ্পিতা তা কল্পনা করে নাই। পিতা শিবশঙ্করও সে-কথা তাহাকে বলেন নাই। বলিলে দুঃখ দেওয়া ভিন্ন আর কোন লাভ হইবে না তো...

মোটরে চড়িয়া নিত্য বৈকালে বাপের সঙ্গে সে বেড়াইতে বাহির হইত। তিন মাস পূর্ব্বে মোটর গিয়াছে...শিবশঙ্কর বলিয়াছিলেন,—এখন এ গাড়ীটা ছেড়ে দি। ভালো খদ্দের মিলছে...এর পরে হয়তো লোহার দরে ছাড়তে হবে।

পুষ্পিতা নিঃশব্দে এ-কথা শুনিয়াছে। বুঝিয়াছে, মোটর চলিয়াছে জন্মের মতো! ও-মোটর এ-জন্মে আর ফিরিবে না। বুঝিয়া তাই কোনো কথা বলে নাই...

দিনে দিনে জীবন বেগে গড়াইয়া চলিয়াছে রসাতলের অন্ধকূপে... এ গতিবেগ কে রোধ করিবে?

আজ ট্রাজেডির চূড়ান্ত...বস্তুটুকু ছিল দুর্দ্দিনের আশ্রয়...তাও গেল।

উঠে বসবে !···হুঁঃ...তুমি ফিরে এসো···এসে যত পারো, খি
খেয়ো···

পুষ্পিতা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাই করিল। শীঘ্র ফিরিয়া আ

বসিবার ঘরে সোফায় বসিয়া শিবশঙ্কর তাঁর মনকে ভাসাইয়া
ছিলেন ভবিষ্যতের কল্পনা-পারাবারে···

পুষ্পিতা ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—বাবা...

শিবশঙ্কর কহিলেন—পুষি...

—অন্ধকারে পড়ে আছো বাবা! কি এ কাণ্ড! বলিয়া
টিপিয়া পুষ্পিতা আলো জ্বালিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—কি রকম আয়োজন করেচে নীলু?

পুষ্পিতা কহিল—রীতিমত যজ্ঞ!

শিবশঙ্কর কহিলেন—বলিস কি পুষি! টাকাকড়ি পাবার আ
ভোজে সব উড়িয়ে দিতে চায় না কি?

শিবশঙ্করের মনে সত্যই মহা দুর্ভাবনা!...ছেলেমানুষ—আমো
ঘটায় হয়তো ন'দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বসিয়াছে!

তিনি কহিলেন—কত টাকা খরচ করেছে মনে হলো? দশ-বা
হাজার?

হাসিয়া পুষ্পিতা কহিল,—তুমি পাগল হয়েছো বাবা! তাও না
মানুষ করে?

শিবশঙ্কর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—করে
হাতে যখন টাকা থাকে, অনেকে তখন নেশায় বিভোর হয়...
টাকা চিরদিন এমনি থাকবে···ঘর-ভরা!

এ কথায় কতখানি ব্যথা, পুষ্পিতা বুঝিল।...পিতা দু' হাতে পয়সা
করিয়াছেন, সত্য! কিন্তু কেন? তাঁর স্ত্রীপুত্র কোনো দিকে কোনো

ভেবে আমি বলচি, তুমি ঘুরে এসো···অন্ততঃ মিনিট ক[illegible]র জন্য। না হলে গাড়ী ফিরিয়ে দিলে বেচারা মনে ব্যথা পাবে। কা[illegible] লোকের মনে ব্যথা দিয়ে···

পুষ্পিতা কহিল—আমাকে নীলুদা টেলিফোন করেছি[illegible]...সন্ধ্যার আগে। আমি তখনি বলেছিলুম আমার যাওয়া হবে না...তাছাড়া আমি নিজের হাতে রেঁধেছি...বসে তোমাকে না খাওয়ালে আমার তৃপ্তি হবে না···

মেয়ের মনের পরিচয় শিবশঙ্করের ভালো করিয়া জানা আছে। তিনি কহিলেন—বেশ, তুমি ঘুরে এসে আমাকে খাইয়ো। সেখানে দেরী করো না...বলো, বাবার শরীর ভালো নয়···তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে...

দাঁড়াইয়া পুষ্পিতা কি ভাবিল, তারপর বলিল—বেশ, আমি যাবো,—কিন্তু শুধু [illegible]···তখনি ফিরে আসবো...

শিবশঙ্কর কহিলেন—তাই এসো। তুমি তাহলে তৈরী হও...

পুষ্পিতা কহিল,— রাণীর বেশে যাবো না...

শিবশঙ্কর কহিলেন—তা বলে...

পুষ্পিতা কহিল—অভদ্র বেশেও যাবো না, বাবা। যেমন মানুষ তেমনি বেশে যাবো। রাণীর সাজ মনে হলে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জ্বালা করবে...সে-বেশ আমি সহ্য করতে পারবো না...

খিচুড়ীর সম্বন্ধে কালোর সঙ্গে পুষ্পিতা গিয়া পরামর্শ করিল [illegible]লিল —আমি বাড়ীতেই খাবো কালোদা, নিজের তৈরী রান্না···ত[illegible]মার ভা[illegible] যেন তোমরা খেয়ে ফেলো না...বুঝলে...

হাসিয়া কালো বলিল—না গো না দিদি...এত বৃষ্টি হয়ে গে[illegible] বলে তুমি ভেবেছো অগস্ত্য মুনি ভেসে এসে আমাদের পেটের চু[illegible]

রকমে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য না অনুভব করে! বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজ
লোকজন,...সকলের মুখের পানে চাহিয়া তিনি পয়সা খরচা করি
ছেন···আরো পাঁচ রকমে...? তা হোক্, সেই সঙ্গে ছিল বড় মানুষি
অহঙ্কার, সত্য! কিন্তু এই এত বড় দরাজ ছাতি,...অহঙ্কারটুকু
তুমি শুধু দেখিলে ভগবান? সে অহঙ্কারের সঙ্গে যে দরাজ হা
ছিল...তার দাম কিছু নয়?···

কিন্তু এ সব চিন্তায় ফল নাই!

পুষ্পিতা কহিল—দশটা বাজে, বাবা...আমি কাপড় ছেড়ে খিচু
আনি। কালোদাকে বলি, বারান্দায় আমাদের দুজনের ঠাঁই ক
দেবে।

শিবশঙ্কর বলিলেন—নীলু কি আয়োজন করেছে, বল্ আগে-
শুনি...

পুষ্পিতা কহিল—খেতে খেতে বলবো বাবা...এখন গল্প করবা
সময় নয়।

এ কথা বলিয়া পুষ্পিতা ডাকিল—কালোদা, দু'খানা আসন পে
দাও দোতলার বারান্দায়...তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নেবে...বুঝলে
আজ উড়ে বামুনের রাজ্য-শাসন নয়। আমার হাতে শাসন
পালনের ভার পড়েছে...আমার হুকুম তোমাদের দুজনকেই মানতে
হবে আজ থেকে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পুষ্পিতার চিন্তার সীমা নাই। একটা চিন্তা বিশেষ করিয়া বুকে জাগিয়া রহিল কাঁটার মতো।

পিতার এ নিঃস্বতার পিছনে তার অপরাধও বড় কম নয়। খেয়ালী মেয়ে—তার খেয়াল-নিবৃত্তির জন্য শিবশঙ্কর কি না করিয়াছেন! মা মারা গিয়াছেন আজ দশ বৎসর—পুষ্পিতার বয়স তখন আট বৎসর। মা-হারা মেয়ের সকল দায় সব আবদার শিবশঙ্কর সহিয়া আসিয়াছেন কি সুগভীর ধৈর্য্যে! দশ বৎসরে ছোট-বড় যত আব্দার সে করিয়াছে, সব মনে পড়িল। সে আব্দার মিটাইতে শিবশঙ্কর কোনো দিন ত্রুটি রাখেন নাই...

তার বিবাহের জন্য শিবশঙ্কর একদিন কি প্রয়াস না পাইয়াছিলেন! শিবশঙ্করের মনের মতো পাত্র! পুষ্পিতা বলিয়া বসিল—না বাবা, এখন আমি বিয়ে করবো না। আমি লেখাপড়া করবো। বিয়ে মানে তো পরের জুলুম মেনে জন্তু হয়ে থাকা!

শিবশঙ্কর বলিলেন—কিন্তু এ ছেলেটি বিলেত-ফেরত ব্যারিষ্টার... সে-কালের মতো এর মনের গড়ন নয়।

পুষ্পিতা জবাব দিল—না। এর মধ্যে বিয়ে কেন?...তোমাদের এ সব সাধ এখন রেখে দাও। পাত্র এনে আমায় বিরক্ত করো না, বাবা!

বাপ এ কথা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন···

এখন?

এই পরাজয়ের গ্লানি বহিয়া বাবা তাহারি জন্য ছুটিতে চান পাটের আড়তে দালালী করিতে! গাড়ী ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া কখনও তিনি

পথ চলেন নাই...আজ ক'মাস ধরিয়া তাঁর দুর্দ্দশা সে তো চ
দেখিতেছে !...

এবং পিতার এ দুর্দ্দশা......কতক তারি জন্য। সে সময় বিবা
যদি পুষ্পিতা আপত্তি না তুলিত, শিবশঙ্করকে কখনো আজ এ বয়
এতখানি দুর্ভোগ সহিতে হইত না ! আর যাই করুন, পাটের আড়তে পি
লোকনাথের কাছে উমেদারী করিতেন না, নিশ্চয় !

পুষ্পিতা অপরাধ করিয়াছে এবং সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তও
করিবে।

কি করিয়া ?

চাকরি করিবে। বাবাকে এ-বয়সে পরের কাছে মাথা নীচু করিতে
দিবে না।

কিন্তু কি-চাকরি করিবে ?

সহরের জানা-অজানা পথের উপর দিয়া মনকে লইয়া সে চলিল না
দিকে...কোথায় চাকরি ? কিসের চাকরি ?

বয়স...রূপ...দুনিয়া সম্বন্ধে মূঢ়তা...এ সব কথা মনের আশেপা
মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল···কিন্তু পুষ্পিতা সবলে তাদের দূর করি
দিল।

এবং এমনি নানা চিন্তা করিতে করিতে কখন এক-সময় সে ঘুমাই
পড়িল...

চোখে-মুখে রৌদ্র লাগিয়া ঘুম ভাঙ্গিতে ধড়মড়িয়া পুষ্পিতা উঠি
বসিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখে, আটটা বাজে।

উঠিয়া মুখ-হাত ধুইল, ডাকিল—কালোদা···

নীচে হইতে কালো সাড়া দিল—দিদি···

পুষ্পিতা কহিল,—বাবা কোথায় ?

কালো উপরে আসিল, বলিল—তিনি বাজারে গেছেন। আমি ঝাঁট দিচ্ছিলুম...

পুষ্পিতা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—বাবা চা খেয়ে বেরিয়েচেন?

—না। বললেন, তোর দিদি ঘুমোচ্ছে...আমি ততক্ষণ বাজারটা ঘুরে আসি। এসে দুজনে বসে চা খাবো'খন।

বাবা বাজারে গিয়াছেন! এ কি কখনো কেহ কল্পনা করিতে পারিত!

পুষ্পিতা কহিল—উনুনে আগুন দেছ?

—দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে রাঁধতে হবে না। আমি রান্নার লোক ঠিক করেছি। দু'বেলা দুটি রেঁধে দিয়ে যাবে। মাসে পাঁচ টাকা করে নেবে।

বুকের মধ্যে একরাশ নিশ্বাস ঢেউয়ের দোলায় দুলিয়া উঠিল। পুষ্পিতা কহিল—এ পাঁচ টাকা কোথা থেকে আসবে কালোদা?

কালোদা বলিল—তুমি একরত্তি মেয়ে—টাকার কথায় তোমার থাকা কেন, বুঝি না। বাপের বাড়ীতে এত টাকা-কড়ির হিসেব কোনো মেয়ে রাখে না।...হ্যাঁ...বিয়ে হলে জামাইবাবুর পয়সা রক্ষা করো প্রাণপণে যে, লাভ হবে।

পুষ্পিতা কহিল—না কালোদা...আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে! লোক এনো না, আমি রাঁধবো।

কালো কহিল—লোক এসে গেছে দিদি। খেতে পায় না...বেচারী! বাবু তাকে বলে গেছেন, আচ্ছা, তুই থাক। এখন তাকে বিদেয় দিলে তার মনে কতখানি, ব্যথা লাগবে সেটা ভেবে দেখো। অভাবে পড়ে তোমার এখানে যাহোক একটু আশ্রয় পেয়েছে, তার সে আশ্রয় তুমি ভেঙ্গে দেবে?

পুষ্পিতা বুঝিল, তবু কহিল—না কালোদা, তুমি বুঝতে পারচো না...

কালো কহিল—আমি খুব বুঝেছি। তুমি আর এ বয়সে অত কিপটে-পনা করো না বাপু...তার চেয়ে বলো, এখন কি চায়ের জল চড়াবো তোমার জন্যে ?

কি পুষ্পিতা কহিল—না...

পুষ্পিতার স্বর গাঢ়।

কালো বলিল—বেশ, বাবু এলেই তাহলে জল চড়াবো। ...কেমন ?

কথাটা বলিয়া কালো নীচে চলিয়া গেল। পুষ্পিতা চুপ করিয়া সামনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল···রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। কাল ঐ আঁধার-ভরা কালোর পরে এ আলো আবার দেখিবে, এমন কথা মনে হয় নাই! তবু আলো তো জাগিয়াছে!

সত্যই তাই হয়? আঁধারের পরে আলো সত্যই তাহা হইলে জাগে, ভগবান ?

এমনি চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে পুষ্পিতার সহসা মনে হইল, জীবনের পথে যে-জায়গায় কাল ছিল, সে জায়গা হইতে একরাত্রির মধ্যে কত, কতদূরে আগাইয়া আসিয়াছে! কাল যেখানে ছিল, সেখানে মাথার উপরে ছিল নীল-নির্ম্মল আকাশ...সূর্য্যের কিরণে কখনো সে আকাশ বোলতার পাখার রং‌ে রঙীন হইত, কখনো বা জ্যোৎস্নার রজত-ধারায় সারা আকাশ রূপালি চাদর গায়ে দিত। সে জায়গার চারিপাশে সবুজ তৃণপল্লব...রঙীন ফুলে অরুণ আভা...বাতাস পর্য্যন্ত রঙীন হইয়া উঠিত!...সে বাতাসে গানের সুর ভাসিত! আশা ও হাসি, হাসি ও আশা দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত ছিল...তখন তার বয়স ছিল তরুণ, মন ছিল তরুণ।

কিন্তু একটি রাত্রির অবসানে···কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! আকাশে সূর্য্যের তাপ প্রখর···ধূলায় ধূমে বাতাস ভরিয়া আছে···বাতাসে

সে হিল্লোল নাই—ফুলে সে রঙীন আভা, গানে সে সুর নাই! সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। আশা নাই, হাসি নাই, মানুষের কলরব নাই। তার বয়স যেন চল্লিশটা বৎসর অতিক্রম করিয়া এক নিরানন্দময়তার শুষ্ক কঠিন প্রান্তরে পড়িয়া গভীর শ্রান্তিতে ধুঁকিতেছে! এত ক্লান্তি, এমন অবসাদ মানুষের দেহ-মনকে বার্দ্ধক্যে জড়িত করিতে পারে, এ কথা কাল সন্ধ্যার আগে সে কল্পনা করিতে পারিত না···

বাড়ীর সামনে বড় একখানা মোটর আসিয়া থামিল। গাড়ীর শব্দে পুষ্পিতার চেতনা হইল। ঝুঁকিয়া নীচে চাহিয়া দেখে, গাড়ী হইতে নামিল নীলাদ্রি।

পুষ্পিতা চমকিয়া উঠিল। মন এখন কাহারো সঙ্গ চাহে না...একা থাকিতে চায়। এ সময় কেন আসিল নীলাদ্রি?

এ-চেতনা জাগার সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্ত অবসন্ন মনকে সবলে ধাক্কা দিয়া সে সজাগ করিয়া করিয়া তুলিল। অভিনয় করিতে হইবে। মনের সত্য ভাব চাপিয়া মুখের কথায়-হাসিতে এমন ভাব দেখাইবে, যেন তার কোথাও কিছু ঘটে নাই! কাল রাত্রে দু-চারিটা মাপা-কথা কথায় নীলাদ্রির কাছে নিজেকে ধরা না দিয়া কোনো মতে পলাইয়া আসিয়াছিল!···কিন্তু আজ···? এখন...?

নীলাদ্রি একেবারে উপরে আসিল···এ ঘরে...ও ঘরে উঁকি দিয়া কাহাকেও না দেখিয়া অবশেষে বারান্দায়···

বারান্দায় পুষ্পিতাকে দেখিয়া নীলাদ্রি কহিল—ব্যাপার কি পুষ্প? ই সকালে এমন নীরব! এমন তো কখনো দেখিনি!···ভোরে রা বাড়ী তোমার গানের সুরে ভরে থাকে···

পুষ্পিতা কহিল—চিরদিন মানুষের একই জিনিষ ভালো লাগে না া। মাঝে মাঝে একটু অদল-বদলের দরকার হয়···just for relief.

কথায় হাসি মিশানো থাকিলেও কথার শেষে পুষ্পিতা একটা নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না।

নীলাদ্রি কহিল—শরীর অসুস্থ…?

ম্লান নয়নে নীলাদ্রির পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া পুষ্পিতা কহিল—তাই।

নীলাদ্রি কহিল—গিয়েই কাল তুমি চলে এলে, একটু দাঁড়ালে না… সেজন্য আমার খুব অভিমান হয়েছিল…আজ ভোরে উঠে মনে হলো, হয়তো তোমার শরীর অসুস্থ ছিল…মুখে দেখে ছিলুম মলিন ছায়া!…তাই এখন খপর নিতে এলুম…

পুষ্পিতা কহিল—বসবে, চলো…

নীলাদ্রি কহিল—বসবার সময় নেই, পুষ্প। জানো তো, কাজের পালা সুরু হয় সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে…কোম্পানিটা চলছে ভালো… সেজন্য খুবই খাটতে হচ্ছে।

মৃদু হাসিয়া পুষ্পিতা কহিল—খাটা ভালো। যারা মানুষ, তারাই খাটে। অপদার্থ অমানুষের দল শুধু শুয়ে-বসে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে; গান গায়, বাজনা বাজায়।…মকর্দ্দমা জিতে আজ তো কুবের হয়েছো… তাই মনে হচ্ছে, এখনো খাটবে?

হাসিয়া নীলাদ্রি কহিল—খাটতেই আমি চাই। মনে হয়, মকর্দ্দমা জিতে বাগান, গাড়ী আর আমোদ-প্রমোদে গা ঢেলে শুয়ে পড়বো না। …তুমি কি পরামর্শ দাও?

পুষ্পিতা কহিল—খাটো, কাজ করো।…অলস হয়ে পড়ে থাকায় আমার ভারী অস্বস্তি লাগে।…সত্যি বলছি…আমাকে একটা কাজ দিতে পারো? আমিও খাটবো।…না, না, হাসি নয়…তামাসা করছি না। এভাবে প্রজাপতি সেজে থাকায় সত্যি আমার অস্বস্তি ধরে গেছে।

আমাকেও [illegible] নীলুদা তোমাদের কোম্পানিতে…আমিও কাজ করতে চাই।

হাসিয়া নীলাদ্রি কহিল—কি কাজ করবে তুমি ?

পুষ্পিতা কহিল,—কোনো কাজ নেই যা আমি করতে পারি ?… আচ্ছা, তোমাদের ওখানে কি কি কাজ হয়, বলো…

নীলাদ্রি কহিল—নানা সাবজেক্টে বই লেখানো হচ্ছে। মানে, স্কুল-কলেজে পড়াবার মতো বই…ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান…তারপরে আছে ছেলেদের জন্য রূপকথার বই। যাদের একটু বয়স হয়েছে, এমন সব পাঠক-পাঠিকার জন্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক…তার উপর একখানা মাসিক কাগজ বার করবো ভাবছি, পূজার পর থেকে…একখানা মাসিক ছেলেদের জন্য, আর একখানা বয়স্ক পাঠকদের জন্য…

পুষ্পিতার চোখের সামনে জাগিতেছিল এক বিরাট কর্ম্মশালা… সেখানে লোকজন আলস্য জানে না…অবিরাম কাজ করিতেছে…

পুষ্পিতা কহিল—এত কাজ…আমি এর কোনোটা করতে পারি না ? কোনো দিকে আমার কোনো ক্ষমতা নেই, ভাবো ?

নীলাদ্রি হাসিল। হাসিয়া কহিল—কি করবে তুমি, বলো…

পুষ্পিতা কহিল—বই লিখবো। ঐ যে টেক্সট-বুক লেখার কথা বলচো…তার একটা কিছু লেখার ভার আমাকে দাও…না হয় বিলিতি রূপকথা থেকে বেছে বাঙলায় কতকগুলো ট্রানশ্লেসন করে দিই… লেখার অভ্যাস কখনো করিনি। গোড়ায় তোমরা দেখে দিয়ো… তারপর ঠিক হয়ে যাবে'খন।

নীলাদ্রি কহিল—বেশ, তুমি লেখো। দেখবো'খন।…এখন তাহলে আসি…তোমার শরীর ভালো তো ? ও বেলায় আবার আসবো'খন।

সত্যি, এত পরিশ্রম চলেছে, কোনোমতে যদি একবার দাঁড়াতে পারি তাহলে অবসর মিলাবে। এখন পৃথিবীর কোনোদিকে চাইবার অবসর মিলচে না।

নীলাদ্রি গমনোদ্যত হইল। পুষ্পিতা কহিল—না নীলুদা··· আমার কথা উড়িয়ে দিলে চলবে না।···আমি সত্যি বলচি, আমি কাজ করতে চাই। কাজ না পেলে···

কথা বাধিয়া গেল···বাষ্পোচ্ছ্বাসে।

নীলাদ্রি তার পানে ফিরিয়া চাহিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিতা কহিল—কি যে করবো, জানি না! তবে মনে হচ্ছে, আমি যেন বাঁচবো না!

এ-কথায় নীলাদ্রি শিহরিয়া উঠিল। শুধু মুখের কথায় হয়তো এ শিহরণ জাগিত না! কিন্তু স্বরের বাষ্পার্দ্রতায় কণ্ঠের বিগলিত ভাবে নীলাদ্রির বুকখানাও অশ্রুসিক্ত হইল।

নীলাদ্রি পুষ্পিতার পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল···নির্ব্বাক। কৌতূহলে তার মন ভরিয়া উঠিল। পুষ্পিতা কহিল—দেবে আমাকে তোমাদের আপিসে কোনো কাজের ভার?

নীলাদ্রি কহিল—ভেবে দেখবো...তোমায় suit করে, এমন কিছু কাজ···

পুষ্পিতা কহিল—তামাসা করচো না?

নীলাদ্রি কহিল—না...

পুষ্পিতা কহিল—একটু শীগ্‌গির করে' ভেবো···তোমার এত কষ্ট পরিশ্রমের মধ্যে এ কষ্টটুকু করো নীলু দা ···

নীলাদ্রি কহিল—আচ্ছা···

নীলাদ্রি চলিয়া গেল। পুষ্পিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল...এক পা নড়িল না। সে যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে...

সহসা নীচে হাসির একটা প্রবল উচ্ছ্বাস! শিবশঙ্করের হাসি!... যেন পাগলের হাসি!...

চমকিয়া পুষ্পিতা নীচে নামিয়া আসিল।

সিঁড়ির নীচে শিবশঙ্কর দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁর এক হাতে ঝাড়নে-বাঁধা তরী-তরকারীর রাশি। অপর হাতে জালি। সামনে নীলাদ্রি।

পুষ্পিতাকে দেখিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—নীলু অবাক হয়ে গেছে আমার হাতে বাজারের পুঁটলি দেখে রে!...আমি বলি, সখ। আমার যদি সখ হয়...তাতে দোষ আছে? হাঃ হাঃ হাঃ—নীলু যেন ভূত দেখেছে...ওর মুখের ভাবখানা দ্যাখ্ পুষি...

সে হাসি থামিতে চায় না...বিরাট রোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া বহিয়া চলিল!

পুষ্পিতা নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না...ছুটিয়া পাশের ড্রয়িং রুমে গিয়া একটি সোফার উপরে নিজেকে একবারে লুটাইয়া দিল... তার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা...

৮

দুপুর বেলা মেয়ের সঙ্গে বাপের কথা হইতেছিল।

পুষ্পিতা বলিল—বাঙ্‌লা কাগজে দেখছিলুম, নৈহাটির কাছে ভাটপাড়া। সেখানে এক মেয়ে-স্কুলে তারা একজন লেডি-টীচার চায়। স্কুলের সঙ্গে ঘর আছে, সেইখানে থাকতে দেবে, আর মাইনে মাসে ত্রিশ টাকা। টীচার যদি গান-বাজনা শেখাতে পারে, তাহলে আরো দশ টাকা বেশী দেবে।…আমি ভাবচি, সেখানে একটা চাকরির দরখাস্ত লিখে পাঠাবো!

শিবশঙ্করের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। মেয়ের পানে যে-চোখে তিনি চাহিলেন, সে-দৃষ্টিতে পুরাণের যুগ হইলে সারা পৃথিবী হয়তো পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়া যাইত! এ যুগে বিজ্ঞানের লীলা-কৌশলে পৃথিবীর হাত-পা বাঁধা, তাই সে পাষাণ বনিল না।

শিবশঙ্কর বলিলেন—বলিস কি পুষি? না, না, তা হতে পারে না।

শান্ত অচপল স্বরে পুষ্পিতা কহিল—কেন হতে পারবে না, বাবা? চুরি-ডাকাতি নয়, ভিক্ষে নয়। নিজের সামর্থ্যে কাজ করে পয়সা নেবো…সারা পৃথিবীতে মেয়ে-জাত এভাবে পয়সা রোজগার করছে। আমাদের দেশেও কত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে মাষ্টারী করে পয়সা রোজগার করছেন যে! সেজন্য কেউ তাঁদের হীন-চোখে দেখে না। পরের হাততোলায় থাকা কিম্বা দারিদ্র্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার চেয়ে এতে মান আছে—ইজ্জৎ আছে।

শিবশঙ্কর বলিলেন—লোকে কি বলবে, মা…? এ কথা যদি শোনে? …যে-বংশে জন্ম…

পুষ্পিতা কহিল—অভাবে-দুঃখে হাহাকার করে বেড়াবে শুধু ঐ বংশের খুঁটী ধরে ?…না বাবা, বংশের মান-মর্য্যাদা তাতে বজায় রাখা যাবে না। সে মান-মর্য্যাদা বজায় থাকবে মনুষ্যত্বে।…শক্তি থাকতে যে-মানুষ দুঃখে-অভাবে হাহাকার করে মরে,তার মান কোনোকালে কেউ রাখে না।…আমি অনেক ভেবেছি—অভিমানে এ কথা বলছি না, রাগ করেও বলছি না…এসো, দুর্দ্দিনে মানুষের মতো যুদ্ধ করে এ-দুর্গতিকে দূর করি।…ছ'মাস পরে তোমাকেও তো বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। এ ছ'মাস এ-বাড়ীতে থাকা—সে লোকের অনুগ্রহে ! সে অনুগ্রহ কেন নেবো ? তার চেয়ে অনাবশ্যক জিনিষপত্র বেচে দিয়ে চলো দুজনে ভাটপাড়ায় যাই…বাপেতে-মেয়েতে থাকবো। স্বচ্ছন্দে আমাদের দিন চলে যাবে !

শিবশঙ্কর স্থির অবিচল নেত্রে পুষ্পিতার পানে চাহিয়া রহিলেন। পুষ্পিতার কথার পিছনে যেন আলোর রশ্মি ঝলকিত দেখিলেন ! কাল বড় মুখ করিয়া বলিয়াছেন, একটা কোনো কাজ করিব…কিন্তু এখানে কোথায় কাজ মিলিবে ? কি কাজ মিলিবে ? লোকনাথ বলিয়াছে, তার পাটের কারবার আছে—সেখানে কাজের ব্যবস্থা সে করিয়া দিবে।

এখন মনে হইল, কি কাজ দিবে ? সে কাজের জন্য তার মুখের পানে কতখানি প্রত্যাশা লইয়া চাহিয়া থাকিতেন ! সে প্রত্যাশায় কতখানি অনিশ্চয়তা ! তার চেয়ে চল্লিশ টাকার অবলম্বন…এ যে অকূলে কূল পাওয়া !

কিন্তু পুষ্পিতা ?…সে করিবে চাকরি ! যে পুষ্পিতার জন্য তিনি…

সারা মনে চমকের প্রবাহ ! যদি কোনোদিন জীবনের ওপারে পুষ্পিতার মায়ের-সঙ্গে দেখা হয়, তাঁকে কি বলিবেন ?…

তাছাড়া পুষ্পিতা যে চাকরি করিবে তাহাতে এখনকার মতো অভাব না হয় ঘুচিল...তারপর? কতদিন সে চাকরি করিবে? চাকরির বোঝা বহিয়া তার ইহ-জীবনটাকে সংসারের সকল উপভোগে বঞ্চিত রাখিয়া তাপসী বনিয়া থাকিবে? কোন্ বাপ মেয়ের সম্বন্ধে এ কল্পনা সহিতে পারেন?...

বেদনায় মন নিষেধ তুলিল—না, না...

তার চেয়ে ধরো গিয়া ঐ বিপুল ধনী নীলাদ্রিকে...পুষ্পিতাকে সে ভালো করিয়া জানে! নীলাদ্রি এখনো বিবাহ করে নাই! কে জানে, হয়তো তার মনের বাসনা...এই পুষ্পিতাকেই কেন্দ্র করিয়া একখানি গৃহ-সংসার রচনা করিতে চায়। মেয়ে স্কুল-মাষ্টারী করিতে গেলে নীলাদ্রি কি আর তাকে বিবাহ করিবে? মেয়েরা টিচারী করিলেও যে দেশ .. দেশকে তিনি জানেন, চেনেন তো...

শিবশঙ্কর বলিলেন—না মা...ও কথা মনেও আনিস্ নে। যতক্ষণ আমি আছি, আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতে দে। তারপর...

বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথা আর বাহির হইল না! শিবশঙ্কর মেয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। আসামী যে-দৃষ্টিতে দণ্ডমুণ্ডের মালিক হাকিমের পানে চাহিয়া থাকে, তাঁর চোখে তেমনি দৃষ্টি!

পুষ্পিতা কহিল—তোমার যেমন কর্ত্তব্য আছে, আমারো তেমনি তোমার সংসারে কর্ত্তব্য আছে, বাবা। আমি যদি ছোট থাকতুম, যদি আমার কোনো শক্তি-সামর্থ্য না থাকতো, আর পাঁচজন মেয়ের মতো যদি নির্জ্জীব অসহায় হতুম, তাহলে এ-কথা আমার মনেও আসতো না! তোমাকে পথে ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে অন্ধের মতো আমি বসে থাকতুম। তা যখন আমি নই...আমার যখন শক্তি-সামর্থ্য আছে, মনে সাহস আছে...পৃথিবীর পথ-ঘাট ও যখন আমার অজানা নয়, তখন আমি

তোমার এ নিষেধ মানবো না। যে ভাবে আমাকে মানুষ করেছো, তাতে আমার পক্ষে অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করে নিঃসহায়ের মতো হাত-পা গুটিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা সম্ভব হবে না। সেভাবে আমি থাকতে পারবো না...থাকলে বোধ হয় আমি বাঁচবো না।

পুষ্পিতার কণ্ঠস্বরে যেমন আবেগ, তেমনি দৃঢ়তা! শিবশঙ্কর এ কথার কোনো জবাব দিতে পারিলেন না। পুষ্পিতা কহিল, —এই যে টেলিফোন রয়েছে...কেন অনর্থক এ খরচের জের টানচো? আজই আমি টেলিফোন-অফিসে চিঠি লিখে দিচ্ছি... তারা টেলিফোন তুলে নিয়ে যাক! তারপর ঐ ইলেক্ট্রিক-কনেক্শন ...পাখা চালিয়ে হাওয়া খাবো, সে সামর্থ্যের আমাদের অভাব! তাদেরো চিঠি লিখে দাও···কনেকশন্ কেটে দিয়ে যাক!···দুঃখ করো না বাবা...এ সব হলো বিলাসের ব্যাপার! অভাব ঘুচিয়ে স্বচ্ছলতা যখন প্রচুর হয়, মানুষের এ-বিলাস তখন সাজে। এখন ইলেক্ট্রিক আলো না জালিয়ে ইলেক্ট্রিক পাখা না চালিয়ে আমাদের দিন যাবে। হয়তো অভ্যাস-বশে একটু বাধবে...কিন্তু সে দু' দিন! তারপর ইলেক্ট্রিসিটির অভাব জানতেও পারবো না!...তুমি অমত করো না!...তোমার মত না থাকলে আমার পক্ষে এ-সব ব্যবস্থা করা হয়তো সহজ হবে না...কিন্তু না করে যখন উপায় নেই, তখন অবুঝ হয়ে অনর্থক দুঃখ-বরণ করা! লক্ষ্মী বাবা, মত দাও..এতে তোমার মান-ইজ্জতে এতটুকু ঘা লাগবে না! বরং এ অবস্থায় এখান থেকে দূরে গিয়ে তুমি স্বস্তি পাবে, আমিও শান্তি পাবো...নয়? ভেবে ছাখো তুমি...

শিবশঙ্কর যেন চেতনা হারাইয়া বসিয়াছেন···তবু সে নিশ্চেতনতার মধ্যে যেন মুক্তির আভাস!...একটা কথা বুকের উপরে মুহুর্মুহু আঘাত

দিতেছিল—সে যেন মুগুরের ঘা! ' কেবলি মনে হইতেছিল—যদি অবস্থা না ফেরে, পুষ্পিতা তার জীবনকে এ-দারিদ্র্যে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে?

পুষ্পিতা কহিল—এক দিনে তোমার কি মূর্ত্তি হয়েছে, আয়নার সামনে গিয়ে একবার গ্যাখো দিকিন্!...এত যে দুর্ভাবনা হচ্ছে...যদি কোনো দিকে কূল না পাও, সে দুঃখ সহ্য করতে পারবে?...

একটা নিশ্বাস শিবশঙ্করের মনের ভিতরে আতালি-পাতালি করিয়া ফুঁশিতে ছিল। সে নিশ্বাসের চাপে বুকখানা বুঝি ভাঙিয়া যাইবে... প্রচণ্ড তার বেগ! শিবশঙ্কর নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না!...

পুষ্পিতা কহিল—সে দুঃখ তুমি কখনো সহ্য করতে পারবে না! তখন...?

দুর্দ্দিনের কালো ছায়া দিনের আলোটুকুর উপরে যেন নিবিড় আবরণ টানিয়া দিল।

পুষ্পিতা কহিল—যদি সে দুর্ভাগ্য আমার কোনো দিন ঘটে, তখন কে আমাকে দেখবে? কি করে আমার দিন কাটবে? এ আমি যা বলছি, বুঝে গ্যাখো...কোনো রকম সেন্টিমেণ্টালিটি করো না...এ কঠিন বাস্তব...stern reality...বোঝো, আমার কথা শোনো...বেশ তো, ভাটপাড়াতে থেকেও তুমি কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখতে পারো!

শিবশঙ্কর স্তম্ভিত, নির্ব্বাক...

পুষ্পিতা তাঁর পানে চাহিয়া রহিল উত্তরের প্রত্যাশায়...

শিবশঙ্কর যেন পাথর বনিয়া গিয়াছেন! পুষ্পিতা বুঝিল, যে-বাপ একদিন...

কিন্তু উপায় কি? সেদিন ছিল সেদিনকার মতো...এদিনে-সেদিনে যখন আকাশ-পাতাল তফাৎ...

মায়ায় মমতায় পুষ্পিতা একেবারে গলিয়া পড়িল···দুঃখের কত বড় আঘাতে ও-মূর্ত্তি এমন পাথর বনিয়াছে··· পুষ্পিতা বাপের বুকের উপরে পড়িয়া বিগলিত কণ্ঠে ডাকিল,—বাবা···

দু' হাতে শিবশঙ্করের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপরে মুখ ঘষিতে ঘষিতে পুষ্পিতা বলিল,—লক্ষ্মী বাবা...অমত করো না। কি কষ্ট তুমি সইচো...আমি তা বুঝতে পারছি। তোমার এ কষ্ট আমি সহ্য করতে পারচি না...তুমি আমাকে বারণ করো না। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো আমার কথা শোনো।

মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া শিবশঙ্কর আবার একটা নিশ্বাস ফেলিলেন...সে নিশ্বাসে এমন বেগ যে পুষ্পিতার মনে হইল, এ নিশ্বাসের সঙ্গে শিবশঙ্করের প্রাণটুকু বুঝি বাহির হইয়া গেল!

মাথা তুলিয়া সে ডাকিল—বাবা...

৬

দু' দিন পরের কথা।

সকালে কতকগুলা খরিদ্দার আসিয়া নীচে ভিড় জমাইয়া ছিল... একজন ক্যাবিনেট-মেকারের সহিত বন্ধুতা ছিল। শিবশঙ্করের কথায় সে পাঠাইয়া দিয়াছিল কয়েকজন ভদ্র খরিদ্দার ফার্ণিচার কিনিবার অভিপ্রায়ে। ফার্ণিচারের গায়ে দাম-লেখা টিকিট...

পুষ্পিতাই এ ব্যবস্থা করিয়াছে। ফার্ণিচার লইয়া দরদস্তর করিতে বাপের বুকে ব্যথা বাজিবে...তাই শিবশঙ্করকে পুষ্পিতা নিজের কাছে দোতলায় বসাইয়া রাখিয়াছে...নীচে খরিদদারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে কালো...এ-ট্রাজেডির মধ্যে পুষ্পিতা শিবশঙ্করকে ছাড়িয়া দেয় নাই!

দু'জনে বসিয়া লুডো খেলিতেছিল। এ খেলায় বাপের বড় অনুরাগ। বাপকে পুষ্পিতা তাই খেলায় ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

সহসা নীলাদ্রি আসিয়া হাজির। নীলাদ্রি কহিল—টেলিফোন কাটিয়ে দেছেন কাকাবাবু?

শিবশঙ্করের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কি বলিয়া ইজ্জৎ রাখিবেন?

পুষ্পিতা কহিল—হ্যাঁ। দিনকতকের জন্য আমরা বাইরে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভালো নেই। ডাক্তাররা বলছেন, এখান থেকে যত শীগগির বেরিয়ে পড়তে পারেন, মঙ্গল!...

নীলাদ্রি অবাক! কহিল, কৈ,—সেদিন তো এ-কথা বলোনি আমাকে...

পুষ্পিতা কহিল—তুমি তো জিজ্ঞাসা করোনি...

নীলাদ্রি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল পুষ্পিতার পানে। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল—নীচে একরাশ লোক দেখলুম...

শিবশঙ্করের মাথা আরো নীচু হইল। মনে হইল, পৃথিবী যেন দুলিতেছে!

পুষ্পিতা জবাব দিল, বলিল—হ্যাঁ, সেকেলে ফার্ণিচারগুলো বেচে দিচ্ছি। এত পুরোনো ষ্টাইলের···একালে ওগুলো অচল···না নীলুদা? বাবাও ওগুলো বিদেয় করবার জন্য ক'দিন অস্থির হয়েছেন···

পুষ্পিতার স্বরে সহজ প্রবাহ...কোথাও এতটুকু খোঁচ নাই!

নীলাদ্রি বলিল—আমি এসেছিলুম...মানে,...

এইটুকু বলিয়া নীলাদ্রি থামিল।

পুষ্পিতা কহিল—থামলে কেন? বলো...

নীলাদ্রি বলিল,—কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, নীলাম্বর বলে' একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কাল রাত্রে গিয়ে দেখা করেছিলেন। বললেন, আপনি তাঁকে খুব ভালো রকম জানেন। আমাদের অফিসে একজন বিল-কালেক্টর দরকার—ত্রিশ টাকা মাইনে... পাঁচশো টাকা জমা দিতে হবে। তাই তিনি গিয়ে ধরেছেন, তাঁর বড় অভাব···এ চাকরি যদি তাঁকে দি, তাহলে তাঁর সংসার রক্ষা পাবে। জমা দেবেন, এমন সঙ্গতি নেই...বললেন, শিবশঙ্কর বাবুকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন...তাহলেই জানবেন, আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন কি না। আজ তাঁকে দশটার সময় আসতে বলেছি...পাকা কথা দিতে হবে। তাই টেলিফোন করছিলুম...

শিবশঙ্কর বলিলেন—পুষিকে তিনি ছেলেবেলায় পড়িয়েছিলেন। লোকটি খুব ভালো...জ্ঞাতিদের অত্যাচারে ভদ্রলোকের আজ দারুণ দুরবস্থা। আমি জানি...খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী মানুষটি...

পুষ্পিতার বুকের কোণে মমতার পাথার উথলিয়া উঠিল। দুঃখে পড়িয়া মন এমন হইয়াছে যে দুঃখীর কথাই ভালো লাগে। সুখী-জনের কথা শুনিয়া শুনিয়া মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

পুষ্পিতা কহিল—তাঁকে চাকরিটি দাও নীলুদা। পাঁচশো টাকা যে জমা রাখতে পারে, তার চেয়েও ইনি দয়ার পাত্র। পাঁচশো টাকা জমা দেবার সামর্থ্য যার আছে, অভাবের সঙ্গে দুদিন সে আরও বেশী যুঝতে পারবে...যার সে সামর্থ্য নেই, সে দাঁড়িয়েছে একবারে মরণের কূলে।

নীলাদ্রি বলিল—কাকাবাবু যখন বলচেন, ভদ্রলোক বিশ্বাসের যোগ্য, তখন তাঁকে টাকা জমা দিতে হবে না। তাঁকেই এ চাকরিতে নেবো।

পুষ্পিতা কহিল—বড় হয়েছো নীলুদা...এমনি বড় মন যেন তোমার চিরদিন থাকে!

নীলাদ্রি হাসিল। হাসিয়া বলিল—শুনলেন কাকাবাবু...পুষ্পিতা আমাকে কি রকম উপদেশ দিচ্ছে...

শিবশঙ্কর হাসিলেন...মলিন হাসি।

নীলাদ্রি কহিল—তাহলে আসি...কাজ আছে।

পুষ্পিতা কহিল—এ সময়ে মানুষ চা খায় না...নাহলে বলতুম,চা খেয়ে যাও! ...তবে এত ব্যস্তবাগীশ হয়েছো...ভয় হয়, মানুষ-জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত বুঝি তুলে দেবে!

নীলাদ্রি বলিল—যে-কাজে হাত দিয়েছি, সে কাজটায় একটু থিতু হতে দাও...কারো সঙ্গে সম্পর্ক যে তুলে দিইনি, সে পরিচয় তখন ভালো করে জানিয়ে দেবো।...

তারপর সে ফিরিল শিবশঙ্করের দিকে, ফিরিয়া কহিল—আসি কাকাবাবু। নীলাম্বরবাবু চাকরি পাবেন—আজই বেলা দশটায়।

নীলাদ্রি চলিয়া গেল।

শিবশঙ্কর গুম্ হইয়া বসিয়াছিলেন। পুষ্পিতা কহিল—বসে আছো যে...খ্যালো...এবার তোমার ডাইস্ ফেলবার পালা...

নিশ্বাস ফেলিয়া শিবশঙ্কর কহিলেন—নীলাম্বরের তাহলে গতি হলো! ...বাঁচলো!

পুষ্পিতা কহিল—তোমার মেয়েরও ভাটপাড়ার স্কুলে চাকরি মিলবে... পরশু আমি আমার application পাঠিয়েছি...

শিবশঙ্কর কহিলেন—হুঁ...

তারপর যন্ত্র-চালিতের মতো লুডোর ডাইস্ ফেলিলেন।......

নীচে কলরব চলিয়াছে...সে কলরব কাণে আসিতেছিল। মনে যা হইতেছিল, সে-মন লইয়া খেলা চলে না। পুষ্পিতা তাহা জানে, তবু শিবশঙ্করের মনকে ওদিক হইতে যতখানি সরাইয়া রাখিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই সে লুডোর ছক পাড়িয়া বসিয়াছে।

বাহিরে দুপ্‌দাপ্ পায়ের শব্দ। সে শব্দ বাড়িয়া ঘরে আসিয়া থামিল। চোখ তুলিয়া পুষ্পিতা দেখে, বিজু। পুষ্পিতা কহিল—আয়। বোস্...

বিজু বসিল, কহিল,—নীচে এত লোক কেন?

পুষ্পিতা সেই একই জবাব দিল। শুনিয়া বিজু কহিল—ও!

শিবশঙ্কর কহিলেন—তোমরা দুজনে কথা কও। আমি একটু ঘুরে আসি।

পুষ্পিতা বলিল—তোমাকে কোথাও যেতে হবে না—আমরা দুজনে ও-ঘরে গিয়ে বসছি।

বিজয়াকে লইয়া পুষ্পিতা আসিল পাশের ঘরে। ঘরে আছে আসবাবের মধ্যে আছে ছোট একখানি খাট, একখানি ড্রেশিং টেব্‌ল্ এবং একটি আয়নাদার আলমারি।

বিজু কহিল—ব্যাপার কি পুষি, ফার্ণিচার বেচে দিচ্ছিস ?

পুষ্পিতা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

বিজু কহিল—কেন ?

পুষ্পিতা কহিল—এত সব ভারি ভারি জিনিষ আছে—যেন জগদ্দল পাথর !...তার উপর সবই সেকেলে ফার্ণিচার...ধর্, এসবগুলো বিদায় করে' যদি একেলে ধরণের বাছাই-করা ফার্ণিচার কেনা যায় ?

বিজু বলিল—তা বটে! ...অনাবশ্যক বোঝা...যত হাল্কা করা যায়!

বিজু একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া লইল...যেন মনে মনে কল্পনা করিল, কোথায় একালের কোন্ ফার্ণিচার বসাইলে ঘরের বাহার খোলে...অনাবশ্যক বোঝার ভার দূর হয়!

পুষ্পিতা কহিল—তারপর ..হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে কি মনে করে ?

বিজুর মুখে লজ্জার রক্তিম উচ্ছ্বাস এক ঝলক বাতাসের মতো বহিয়া গেল।

বিজু কহিল—তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল...

পুষ্পিতা কহিল—সেই পুরোনো কথার জের না কি ?

বিজুর জীবনে ছোট একটা সমস্যা জাগিয়াছিল। ধর্ম্মকর্ম্মে প্রগতির মার্গে সেকালে যাঁরা অগ্রদূত হইয়াছিলেন, বিজুর পিতামহ হরিশবাবু ছিলেন তাঁদেরই একজন পতাকা-ধারী। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি শুধু অন্দরের পর্দ্দা সরাইয়া তৃপ্ত রহিলেন না, স্ত্রী হৈমবতীকে বেশী বয়সে লেখাপড়া শিখাইবার অভিপ্রায়ে স্কুলে ঢুকাইয়া তাঁকে দিয়া দুটা পরীক্ষাও পাশ করাইলেন! পাশ করিয়া হৈমবতী চাকরী গ্রহণ করিলেন এবং সমাজের নিষেধ-বিদ্রূপকে চাব্কাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হরিশবাবু ব্রাহ্ম সমাজে নাম লিখাইয়া গোঁড়া ব্রাহ্ম হইলেন। বিজুর বাবা গিরিশবাবু

পিতার ধর্ম্ম-সাধনার জোরে সেকালের এক ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টারের কেরাণীগিরি অবলম্বন করিয়া সংসারকে স্বচ্ছল করিয়া তোলেন। এবং সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুকে জন্মিয়া বিজু লেখাপড়াও গান-বাজনা শিখিয়া বনিয়াদী সমাজে সহজেই প্রবেশাধিকার পাইল।

বিজু দু-দুটা পাশ করিয়াছে। ছেলেবেলা হইতে পথে-ঘাটে হাঁটিয়া ফিরিয়া ট্রামে-বাসে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাঙালী [illegible] স্বভাবগত ভীরুতার হাত হইতে নিজেকে বহু উর্দ্ধে তুলিয়াছে। [illegible]টা বাড়ীতে মেয়েদের সে গান শেখায়। বেতারের আসরে এবং গ্রামোফোনের রেকর্ডে মাঝে মাঝে আধুনিক সঙ্গীত গাহিয়া নিজের [illegible]কে সৌখীন সমাজে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

শুশিতার সঙ্গে তার পরিচয় ছেলেবেলায় স্কুলে দুজনে এক ক্লাসে পড়িত, সেই সময় হইতে।

বিজু এখন ঝামাপুকুরের নারী-স্বর-সদনে গান শেখায়। থাকে পার্ক সার্কাসের ওদিকে।

এখন তার জীবনের সেই ছোটখাট সমস্যার কথা বলি।

পাঁচ বৎসর আগে বিজুর বাবা থাকিতেন তালতলার কাছে সার্কুলার রোডের উপর চারতলার এক ফ্ল্যাটে তেতলায় দুখানি কামরা ভাড়া করিয়া। বিজুর মা পাঁচ-সাতটি সন্তান প্রসব করিয়া শয্যায় পড়িয়া কোনমতে জীবন রক্ষা করিতেছিলেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজু সকলের বড়—তার উপরেই সংসারের ভার।

দোতলার ফ্ল্যাটে একখানি কামরা লইয়া বাস করিত শুভেন্দু। শুভেন্দু ক্যাম্বেলে পড়িত। শুভেন্দু খুব ভালো গান গাহিতে পারিত। তার কণ্ঠ ছিল চমৎকার। বেতারের আসরে গান গাওয়ার সঙ্গে দিকে দিকে তার খ্যাতি রটিয়াছিল। এবং এই গান গাওয়াকে

উপলক্ষ করিয়া শুভেন্দুর সহিত বিজুর পরিচয়, ক্রমে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। দোতলার ফ্ল্যাটে নিজের কামরা থাকিলেও তেতলায় গিরিশবাবুর ঘরেই শুভেন্দু অধিকাংশ সময় পড়িয়া থাকিত। বিজু ও শুভেন্দু দুজনে একসঙ্গে গান গাহিত—সুর লইয়া বিতর্ক করিত; এবং এই গানের সুরকে অবলম্বন করিয়াই পরস্পরের মনে মনে এমন জোট পাকাইয়া গিয়াছিল যে জগৎ-সংসার ভুলিবার জো!

শুভেন্দুর ক্যাম্বেলের পড়া গেল ঘুচিয়া; এবং একদিন বিজুকে লইয়া সিনেমা-হাউসের বাহিরে আসিয়া শুভেন্দু বলিল—বড্ড মাথা ধরেছে... ভাবছি, কার্জ্জন পার্কে একটু বসে যাবো। তোমার আপত্তি আছে?

বিজু বলিল—চলো।

দুজনে আসিল কার্জ্জন পার্কে। সেখানে কথায় কথায় শুভেন্দুর মাথার যাতনা ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিল এবং সে বিজুর কোলে মাথা রাখিয়া তৃণশয্যায় শুইয়া পড়িল। বিজু তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল...

মাথার উপর একরাশ নক্ষত্র। বিজুর দু'হাত চাপিয়া ধরিয়া হঠাৎ শুভেন্দু বলিয়া বসিল—আমায় তুমি ভালোবাসো বিজু?

মাথার উপর নক্ষত্র-সভায় নক্ষত্রমণ্ডলী যেন আরো তেজে জ্বলিয়া উঠিল...বাতাসের দমকে আশপাশের লতাকুঞ্জ আরও [illegible]...বিজু যেন কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে! সেখান হইতে আর কে যেন কথা কহিল, বলিল,—বাসি...

শুভেন্দু উঠিয়া বসিল, বসিয়া বিজুকে দু'হাত দিয়া টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল...

মাসখানেক পরে বিজু মাকে বলিল, শুভেন্দুকে সে বিবাহ করিবে।

মায়ের মুখ হইতে এ কথা শুনিলেন গিরিশবাবু। গিরিশবাবু তর্জ্জন তুলিলেন—একটা গেঁয়ো ভূত! ওর কি আছে? কি দিয়ে বিজুকে প্রতিপালন করবে? তা'ছাড়া আমরা ব্রাহ্ম—বিজু এমন লেখাপড়া শিখেছে!...অমন গান গায়... এত তার নাম...না।

শাসনের প্রাচীর উঠিল... এবং মনিব-ব্যারিষ্টার সাহেব আইনের এমন প্যাঁচ কষিলেন যে শুভেন্দুকে ফ্ল্যাট ছাড়িয়া সরিয়া পড়িতে হইল।

বিজুর সঙ্গে দেখা বন্ধ রহিল না। এবং দু'জনে একদিন পরামর্শ করিল, এ কঠিন গণ্ডী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে বহুদূরে...সেখানে গিয়া স্বপন-মাধুরী দিয়া প্রেমের কুঞ্জ রচনা করিবে...

কিন্তু বিজু চায় এই খ্যাতি...এ খ্যাতির মোহ সে ছাড়িতে পারিবে না। শুভেন্দুকে বলিল—তুমি কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা ছাখো...সত্যি, স্বপ্ন নিয়ে জীবন চালানো যাবে না...

এ কথায় মনে আঘাত পাইয়া শুভেন্দু কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল...বিজু আর তার দেখা পায় নাই।...তার জন্য মন উতলা হয়... একখানা চিঠি লিখিয়া যদি খপর দিত...

শুভেন্দু চিঠি লিখিল না...

তারপর বিজুরা অসিয়াছে পার্ক সার্কাশে...

ইতিমধ্যে জীবনের পথে বহু পথিক আসিয়া দেখা দিয়াছে। এ সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা'র যুগ...বিজু গান গায়...গানে খ্যাতি আছে... বয়স তরুণ...দেখিতে ভালো...

এ বয়সে পৃথিবীর সঙ্গে বিজুর যেটুকু পরিচয় হইয়াছে...তার ফলে কাহাকেও সে বিমুখতায় ফিরায় নাই...সকলের সঙ্গে হাসিয়াছে, মিশিয়াছে...তার আচরণে কেহ কোথাও বিরূপতা বা বিরাগের চিহ্ন

দেখে নাই! বিজুর মনে জাগিয়া আছে মস্ত আকাঙ্ক্ষা...কিন্তু যে-ঘরে জন্মিয়াছে, সে ঘরে এ আকাঙ্ক্ষার কতখানি পূরণ হইবে? সেজন্য চাই অবলম্বন! কে জানে, কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে অবলম্বন করিবে—তাই সে সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিয়াছে।

একজনের সঙ্গে কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী ভাব। তার নাম অক্ষয়। অক্ষয়ের বাপের পয়সা আছে। লেখাপড়া করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই! গান গাহিয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়া দিন কাটিবে। সে ধরিয়া বসিল—বিজুকে সে তার হৃদয়-রাণী করিবে!

বিজুরা ব্রাহ্ম...তাহাতে কি আসে যায়? অক্ষয় ধর্ম্ম মানে না—কোনো ধর্ম্মের কেয়ার করে না! সে জানে শুধু প্রেমধর্ম্ম...

তার মোটর আজ বিজুদের জন্য। বিজুদের বাড়ী সে নিত্য অতিথি। বিজুর মায়ের চিকিৎসার জন্য তার ছুটাছুটি, পয়সা-খরচের অন্ত নাই। রেশের মাঠে বিজুর বাবাকে বেটিংয়ের পয়সার জন্য ভাবিতে হয় না। অক্ষয় দেয় টাকা; বলে—Try your luck। যদি টাকা পান, তখন শোধ দেবেন। অক্ষয় একালের ছেলে। মানুষের প্রকৃতি সে ভালো করিয়া জানে। দেয়া-নেয়াকে কেন্দ্র করিয়াই পৃথিবী ঘুরিতেছে—নহিলে কবে ঘোরা বন্ধ করিয়া পৃথিবী থামিয়া পড়িত,—ইহাই তার বিশ্বাস!

গিরিশ বাবু বলিলেন—সব ভালো...কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম...

অক্ষয় বলিল—ক্ষতি কি! শুদ্ধিতে আপত্তি থাকে, সিভিল-ম্যারেজ-এ্যাক্ট আছে!

গিরিশ বাবু বলিলেন—বেশ বাবা,...তোমাদের যখন মনে-মনে এত মিল...আমি এ-মিলনে বাধা দিতে পারি না। বিবাহের কথা পাকা কিন্তু তা'হলে...

সেদিন বৈকালে রেডিও হইতে বিজু বাহির হইয়াছে, ফটকের সামনে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা। চেহারা দেখিলে কান্না পায়। পয়সার জন্য এ কয় বৎসর সে কি না করিয়াছে! পয়সার দেখা পায় নাই। অবশেষে আজ তিন মাস ট্যাক্সি চালাইতেছে। নিজের গাড়ী। কিস্তিবন্দী সর্তে কিনিয়াছে। ক'মাসে প্রায় পাঁচশো টাকা জমাইয়াছে! বিজুর খপর সে রাখে। সে জানে অক্ষয়ের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যাপার! কতদিন দেখিয়াছে অক্ষয়ের সঙ্গে বিজু গিয়াছে সিনেমায়, কাশানোভায়...

তবু সে বিজুর আশা ছাড়ে নাই...ছাড়িবে না। সে ট্যাক্সি হাঁকায়... কাহারো দাস্য করে না...একদিন অনেক গাড়ীর মালিক হইবে। তখন নিজে গাড়ী হাঁকাইবে না। তার তাবে থাকিবে দশজন বিশজন পঁচিশজন ড্রাইভার!...সুরলোক? সেখান হইতে এখন ছুটী লইয়াছে। এখন তার তপস্যা চলিয়াছে। অর্থ-তপস্যা! এবং এ তপস্যা বিজুর জন্য!

বিজুর গা ছমছম করিয়া উঠিল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার? বিজুর একটা নাম আছে, মান আছে...

শুভেন্দু বলিল, না, সে কোনো নিষেধ শুনিবে না। প্রেমের দায়ে সে না করিতে পারে, এমন কাজ নাই! অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা করিবে—দেখা করিয়া সব কথা বলিবে...তার সঙ্গে বিজুর প্রথম প্রণয়! সে বিজুকে ছাড়িবে না। বিজু তাকে যত চিঠি লিখিয়াছে, তার কোনোখানা শুভেন্দু নষ্ট করে নাই...যদি বিজু তাকে প্রত্যাখ্যান করে, শুভেন্দু তাহা হইলে সে সব চিঠি খপরের কাগজে ছাপাইয়া দিবে!...বিজু যদি নিজের স্বার্থকে সবার বড় করিয়া দেখে, শুভেন্দু তাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিবে। বিজুর জন্য সে কি না সহিয়াছে! ক্যাম্বেল ছাড়িয়া নিজের ভবিষ্যৎ-টাকে পায়ের ঠোক্করে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সে আজ হইয়াছে... ট্যাক্সি-ড্রাইভার!..

সে তিনদিন সময় দিয়াছে! কাল সেই তিন দিনের দিন। বিজু অনেক ভাবিয়াছে! মান-ইজ্জত...ভবিষ্যৎ...সব আজ ভাঙিয়া চূর্ণ হইতে বসিয়াছে !...নিজের উপর রাগ করিয়াছে। কেন তার এমন দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল? যার পয়সা নাই, তার সঙ্গে ছেলে-বয়সে এমন মেলামেশা...

কিন্তু রাগ করিয়া কোনো ফল নাই! তাহাতে সমস্যা ঘুচিবার উপায় মিলিবে না।

তাই বিজু আসিয়াছে পুষ্পিতার কাছে...ভঙ্গুর এ-কাহিনী... প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাহিনী বিজু আসিয়া পুষ্পিতাকে বলিত! পুষ্পিতা ব্যঙ্গ করিবে না, কাহারও কাছে গল্পচ্ছলে এ-কথা প্রকাশ করিবে না...বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া পুষ্পিতা বলিয়া দিবে, বিজু এখন কি করিবে... কি তার কর্ত্তব্য।

এই জন্যই কাতর প্রাণে বিজু আসিয়াছে পুষ্পিতার কাছে......

বিজু বলিল—এখন আমাকে বল্ ভাই, কি আমার কর্ত্তব্য ?

পুষ্পিতা স্তম্ভিত! বসিয়া বিজুর কাহিনী শুনিতেছিল...বিজুর প্রশ্নে সে ভাব কাটিল ; সে বলিল,—কিসের কর্ত্তব্য ?

বিজু বলিল—সব তো শুনলি! অক্ষয় বাবু বলেছে, বিয়ে করবে। অক্ষয় বাবুর অগাধ টাকা, দরাজ মন...

পুষ্পিতা কহিল—অক্ষয়বাবুকে তুইও বিয়ে করতে চাস ?

বিজু কহিল--নিশ্চয়। সে আমাকে সুখৈশ্বর্য্য দেবে। তাকে ছেড়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বিয়ে করি কি বলে ?...মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব, মেলামেশা এক জিনিষ...আর মানুষকে বিয়ে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার!

পুষ্পিতা কহিল - কিন্তু শুভেন্দুকে তো ভালোবেসেছি

বিজু কহিল—সে কি ভালোবাসা! প্রথম-দ... একটা মোহ···fascination...infatuation। এ্যাডভেঞ্চা... বলতে ...রা!

পুষ্পিতার ভালো লাগিতেছিল না!... এ সব আলোচনা তার এত ...ধ্য মনে হয়···একালের দু' একখানা বাংলা নভেলেও এমনি ধরণের ... ছাপা দেখিয়াছে। পরে নায়ক-নায়িকার কি হইয়াছে, পড়িতে পারে ...···এ-সব কথার আভাসে শিহরিয়া সে নভেল ফেলিয়া দিয়াছে।... ...লের সেই সব ঘটনা মানুষের জীবনে সত্যই ঘটে ?

বিজু যখন শুভেন্দুর সঙ্গে তার প্রথম প্রণয়ের কথা বলিত, মন্দ ...ত না! মনে হইত, শুভেন্দুর সঙ্গে তার এত জানাশুনা, এত

মেলামেশা...দুজনে একসঙ্গে বসিয়া গল্প করে, গানে দু' জনের সমান অনুরাগ...এ যেন রোমান্সের মতো···। শুভেন্দু চলিয়া গেলে মনে বেদনা পাইয়া বিজু আসিয়া কত দুঃখ জানাইত···

কিন্তু সে-অনুরাগ···আজ বিজু বলিতেছে, একটা এ্যাডভেঞ্চার!

পুষ্পিতার শিক্ষা, তার সংস্কার এ-কথায় মনকে ভয়াতুর করিয়া তুলিল। মুখে সে কোনো কথা বলিতে পারিল না।

বিজু কহিল—ভয় হয়, বিয়ে হয়ে গেলে শুভেন্দু এসে সত্যি যদি আমার লেখা সেই সব চিঠি অক্ষয়ের সামনে ধরে দ্যায়?...মনের কোনো কথা চিঠিতে আমি গোপন রাখিনি...

বিজুর মুখে দুশ্চিন্তার মলিন ছায়া...নিশ্বাস ফেলিয়া বিজু বলিল—মরে গেলেও শুভেন্দুর সঙ্গে আমি আর মিশতে পারবো না! আর কোনো কাজ ছিল না? শেষে ট্যাক্সি-ড্রাইভারী!...তাছাড়া কি বলে' সে আশা করে, তার দারিদ্র্য আর অভাবকে আমি বরণ করে নেবো? জীবনটা সত্যই তো মন-গড়া উপন্যাস-নাটক নয়, ভাই!... আরামে কে না থাকতে চায়?···ও-সব ভালোবাসাটাসার কথা যাই বলো, এ-বয়সে আমি তো অনেক দেখলুম...ও সব বাজে কথা। এ যুগে হবে pastoral romance?...হুঁঃ। আমি পাগল হইনি...অক্ষয়কেই আমি চাই। তার কারণ, তার পয়সা আছে। সে আমাকে আরামে রাখতে পারবে। সোসাইটিতে আমার পোজিশন্ হবে! চিরদিন মাষ্টারী করে দিন কাটাবো—সে রুচি বা প্রবৃত্তি আমার নেই! মানুষ হয়ে জন্মেচি···মানুষের মতো থাকতে চাই!...গরীব মা-বাপ, কিন্তু মেয়ে-জাতের ভবিষ্যৎ মা-বাপের উপর নির্ভর করে না···নির্ভর করে স্বামীর উপর। সে স্বামী যখন নিজে বেছে নেবো, তখন সব দিক দেখে নিতে হবে তো!

পুষ্পিতা কহিল— এ সম্বন্ধে আমাকে কেনই বা জিজ্ঞাসা করচিস্ বিজু… কি জবাব আমি দেবো ? তবে আমার মনে হয়, ভালোবাসার দাম পয়সা-কড়ির চেয়ে অনেক বেশী…

বিজু বলিল—ভালোবাসা ! ভালোবাসায় অভাব-দুঃখ ঘোচে না… ভালোবাসা সংসারে কি আরাম দিতে পারে? ভালোবাসা সত্য নয়, স্বপ্ন ! কি তার ক্ষমতা ? মনে করলে দু'খানা মনের মতো শাড়ী পরবো, সে উপায় থাকবে না… । বল্ তো, ভালোবাসার ঘোরে মুখোমুখি বসে থাকলে কি দুঃখ ঘুচবে ?…ও সব কথা ভাই, বইয়েতেই মানায়… সত্যকার জীবনে নয় !

পুষ্পিতা কহিল—হবে ! সত্যকার জীবনের এত পরিচয় আমি জানি না…

বিজু বলিল—ধর্, আমি যদি অক্ষয়কে বলি…যে একদিন… যখন কিছুই জানতুম না, তখন গান শিখতে শিখতে মনে হয়েছিল, শুভেন্দুকে বুঝি ভালোবাসি…সে-মোহে দু'চারখানা নভেলী-চিঠি তাকে লিখেছিলুম…তারপর পাঁচ-ছ বছর তার সঙ্গে দেখাশুনা নেই… লোকটা ইতর…এ কথা বলে রাখা ভাল নয় ?

গভীর উদ্বেগে পুষ্পিতা কহিল—আমি ও-সব ঠিক বুঝি না ভাই। তবে বিলিতি নভেলে-নাটকে যা পড়েছি, মনে হয়, বলে রাখা ভালো ! এর পরে যদি শুভেন্দু কোনোদিন এসে উৎপাত-উপদ্রব করে, তখন ভুল বুঝবে না…

বিজু কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল—আবার ভয়ও করে। যদি ভাবে, মেয়েটা এমনি ভাবেই নিজেকে সবার কাছে বিলিয়ে বেড়িয়েছে !…

বিজু চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল—এই নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। তাই এলুম তোর কাছে পরামর্শ নিতে। জানি, তুই

এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবি না, অথচ sincere উপদেশ দিবি!

পুষ্পিতা বলিল—কিন্তু আমার মনে কোনো যুক্তি, কোনো পরামর্শ আসিছে না। মানে, এ সব কথা কখনো ভেবে দেখিনি ভাই। বিলিতি গল্পে পড়ি বটে.. life with a past....কিন্তু সে কি রকম life, তা কখনো ভেবে দেখিনি...কাজেই আমার পক্ষে কোনো মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

বিজু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল...কি ভাবিতেছিল...তারপর হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া ছোট আয়না ও পাউডারের পাফ্ বাহির করিয়া আয়না দেখিয়া মুখের উপরে পাফ্ বুলাইল, বুলাইয়া পাফ্ ও আয়না রাখিয়া পুষ্পিতার পানে চাহিল; চাহিয়া বলিল—এটুকু ভেবে দেখিস্ · আজ আর বসতে পারছি না···অক্ষয় লাহের নেমন্তন্ন করেছে কাশানোভায়। তার আগে গানের একটা টুইশনি সেরে নিতে হবে। আমি তা হলে কাল আসবো'খন...এমন সময়ে। কেমন?

পুষ্পিতা কহিল—এসো···কিন্তু বইয়ে পড়া বিদ্যা নিয়ে এ সম্বন্ধে কোনে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব বলে' মনে হচ্ছে না...

বিজু কহিল—তবু মন থেকে এ কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিস্ নে···নিজেকে আমার পোজিশনে কল্পনা করে একবার ভেবে দেখিস্। তুই হলে এ-অবস্থায় কি করতিস্ ভাবিস্।...কথাটা তোর কাছ থেকে প্রকাশ পাবে না, এ আশা আমার আছে···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিজু চাহিল পুষ্পিতার পানে। পুষ্পিতা কহিল—সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকো।

—আমি তা জানি···বলিয়া বিজু উঠিল; বলিল,—তাহলে কাল আসবো এমনি সময়ে···

বিজু চলিয়া গেল। পুষ্পিতা স্তম্ভিতের মতো বসিয়া রহিল...তা যেন চেতনা ছিল না! মনে হইতেছিল, সত্যকার পৃথিবী ক্রমে যেন দূরে...অতি-দূরে সরিয়া চলিয়াছে...কোথাকার এক অজানা পুরী আসিয়া পৃথিবীর সে খালি জায়গাটুকু অধিকার করিয়া বসিতেছে...

যে-সব ঘটনার কথা বইয়ে পড়িত, সে সব ঘটনা আজ সত্যকার রূপ লইয়া চোখের সামনে উদয় হইতেছে...নিজেদের এ আকস্মিক দশান্তর...বিজুর ব্যাপার...

বিজু বলিয়া গেল, বিজুর পোজিশনে নিজেকে বসাইয়া উপায় চিন্তা করিতে। সে পোজিশনের কথা ভাবিতে গিয়া পুষ্পিতার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কালো আসিয়া একখানা চিঠি দিল। চিঠি ডাকে আসিয়াছে। পুষ্পিতার চিঠি।

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পুষ্পিতা দেখে, ভাটপাড়া নারী-শিক্ষা-সদন হইতে আসিয়াছে। শিক্ষা-সদনের সেক্রেটারী সদানন্দ রায় চৌধুরী চিঠি লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন,

মাননীয়াসু

আপনার আবেদন-পত্র পাইলাম। আগামী রবিবার বেলা নটার সময় কমিটির মিটিং। সে মিটিংয়ে আপনি আসিলে কথাবার্তা কহিয়া নিয়োগ-সম্বন্ধে সব [illegible] পাকা হইতে পারে। ঐ দিনে ঐ সময়ে আসিতে না পারিলে আপনার আবেদন সম্বন্ধে কোনোরূপ বিচার-বিবেচনা করা সম্ভব হইবে না। আশা করি, আপনি আসিতে পারিবেন। ইতি

শ্রীসদানন্দ রায় চৌধুরী
সেক্রেটারী।

আগামী রবিবার? তার অর্থ, কাল!......

চিঠি পড়িয়া বিজুর কাহিনী মনের মধ্যে ঢেউ তুলিল।...অজানা শহর...কেমন সব লোক-জন...কিন্তু ভয় কি? সে তো পার্টিতে যাইতেছে ...চলিয়াছে চাকরি করিতে।

চিঠি লইয়া পুষ্পিতা শিবশঙ্করের কাছে আসিল। শিবশঙ্কর বসিয়া তাঁর গরদের কোটে বোতাম টাঁকিতেছিলেন...

পুষ্পিতা আসিয়া কোট কাড়িয়া লইয়া বলিল—ও কি হচ্ছে! বারণ করেছি না? এ সব কাজ তুমি করবে না...এ হলো আমার ডিউটি।

শিবশঙ্কর বলিলেন—সামান্য কাজ, মা!

পুষ্পিতা বলিল—হোক সামান্য! সামান্য-অসামান্য সব কাজ এখন থেকে আমি করবো...

একরাশ দীর্ঘনিশ্বাস শিবশঙ্করের বুকের মধ্যে তাল পাকাইয়া ঘুরিতেছিল। তিনি হতভম্বের মতো চাহিয়া রহিলেন...

পুষ্পিতা কহিল—আমাদের দেশে মেয়েকে বলে—ঝী...তা জানো? ঝী থাকতে বাপ কাজ করবে, কোনো শাস্ত্রে এমন কথা তুমি খুঁজে পাবে না।

শিবশঙ্কর বলিলেন—যা তুই করছিস মা...এর উপরে আবার...?

পুষ্পিতা কহিল,—তুমি কোনোদিন বোতাম টেঁকেছো যে আজ টাঁকবে?...না...। আমি বেঁচে থাকতে এ-সব চলবে না!...

তারপর জামার পানে চাহিয়া সে হাসিল, হাসিয়া সে বলিল,—কোথাকার বোতাম কোথায় বসিয়েচো ছাখো তো...দাও, জামা গায়ে দাও। ছাখো, এ বোতাম তার ঠিক ঘরে ঢুকবে কি না...

জোর করিয়া শিবশঙ্করকে সে কোট পরাইয়া দিল...জামার বোতাম পরাইতে গিয়া...

শিবশঙ্কর .হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—আরো দু'আঙুল ওপরে বোতাম বসবে।' আনাড়ির হাত, যা...

পুষ্পিতা কহিল—বোতাম টাঁকা বেটাছেলের কাজ নয়, মেয়েদের...

শিবশঙ্কর বলিলেন—কিন্তু তুইই বা কবে বোতাম-টেঁকে বেড়িয়েছিস বল্...

পুষ্পিতা কহিল—এ কাজ আমাদের শিখতে হয় না...এ শিক্ষা আমাদের instinctive...বুঝলে! এই ভাখো···কত শীগগির তোমার কোটে বোতাম বসিয়ে দি...কিন্তু তার আগে...এই চিঠিখানা পড়ো··· এই মাত্র ডাকে এসেছে।

শিক্ষা-সদনের সেক্রেটারীর চিঠি শিবশঙ্করের হাতে দিয়া পুষ্পিতা কোটের বোতাম টাঁকিতে বসিল···

৬

ভাটপাড়ার শিক্ষা-সদনটি ছোট নয়। গঙ্গার তীরে ছোটখাট স্কুল। স্কুলের সঙ্গে মস্ত কম্পাউণ্ড—বাগান, বোর্ডিং। শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার জন্য একতলায় স্বতন্ত্র কখানা ঘর, পার্টিশন-দেওয়া। এই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ঘর।

পুষ্পিতা বলিল—কিন্তু আমার সঙ্গে আমার বাবা থাকবেন। বুড়ো মানুষ...তাঁকে ত্যাগ করে আসতে পারবো না।

সেক্রেটারী বলিলেন,—তা তিনি বুড়ো মানুষ...তাঁর সম্বন্ধে ভিতরে থাকবার ব্যবস্থা হতে পারবে। দশদিন পরে কিন্তু জয়েন করতে হবে আপনাকে···অর্থাৎ ইংরেজি মাসের পয়লা তারিখ থেকে।

পুষ্পিতা কহিল—তাই হবে।···

সেক্রেটারী কহিলেন—আপাততঃ আপনারা পাঁচজন লেডি-টীচার হলেন। পুরুষ-টীচার আছেন তিনজন। একজন পণ্ডিত মশায়, একজন অঙ্কের টীচার, আর একজন আমাদের ড্রয়িং মাষ্টার বাবু। তাছাড়া তু'জন ক্লার্ক আছেন। তাঁরাও পুরুষ-মানুষ।

কলিকাতার হাঙ্গামা চুকাইয়া শিবশঙ্করকে লইয়া পুষ্পিতা আসিয়া স্কুলে যোগ দিল পয়লা তারিখে।

আব-হাওয়া ভালো। পরিচিত কেহ কোথাও নাই...জীবনের যত গ্লানি চুকিয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া জীবন পাতিয়া বসা!

শিবশঙ্কর চুপচাপ গৃহে বসিয়া থাকেন। কখনো খুব খানিকটা টহল দিয়া আসেন। একদিন বলিলেন—চুপচাপ বসে থাকি—সেক্রেটারী সদানন্দ বাবু বলছিলেন বাড়ীর চার্জ্জ নেওয়া, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর হেড ক্লার্কের কাজটা যদি আমি করি, তাহলে ওঁরা মাসে ত্রিশ

টাকা করে দেবেন।...আমি ভাবচি, বলি, হ্যাঁ। মন্দ কি! চল্লিশের উপর আরো ত্রিশ—মাসে সত্তর টাকা করে আয় হবে।

পুষ্পিতার চোখ ঠেলিয়া জল আসিল। ত্রিশ টাকার চাকরির নামে বাপের আজ এমন উৎসাহ, এত আনন্দ! একদিন এই শিবশঙ্করই ড্রাইভারের মাহিনা দিয়াছেন মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া...

কিন্তু বাপের এত আগ্রহে আঘাত দিতে মমতা হইল। কহিল—চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে ভালো...কিন্তু তুমি যে বলছিলে, লোকনাথ বাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা করে পাটের কাজ করবে...

শিবশঙ্কর বলিলেন—ছুদিন গিয়েছিলুম, মা। তার আজ পয়সা হয়েছে ...লোকনাথ আজ আর সে-লোকনাথ নেই...খাতির-যত্ন করলে খুব। তাহলে কি হবে, কাজের কথা তুলতে জবাব দিলে, বাজার এখন খারাপ যাচ্ছে...তাছাড়া ছুটো সম্বন্ধীকে তার সঙ্গে এ-কাজে ঢুকিয়েছে... ছু'এক মাস সবুর করতে হবে!..মাঝে মাঝে গিয়ে আমাকে দেখা করতে বলেছে।

শিবশঙ্কর চুপ করিলেন; তারপর কহিলেন—এই উমেদারী করা... এ-বয়সে পারবো বলে মনে হয় না। তাই ভাবছিলুম, যাচা-চাকরি... হোক্‌গে ত্রিশ টাকা...কি এমন আমাদের নশো পঞ্চাশ টাকা খরচ! কি বলিস মা?

পুষ্পিতা কহিল—বেশ, তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, করো...

শিবশঙ্কর এমনি করিয়া এখানকার কাজে যোগ দিলেন।

দিন বেশ কাটিতেছিল...

সহসা সেক্রেটারি সদানন্দ বাবুর প্রীতি জাগিল বেশী রকম! শিবশঙ্করকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—সন্ধ্যার সময়ে আসবেন আমার ওখানে।...দাবা খেলা আসে তো?

শিবশঙ্কর কহিলেন—এককালে চর্চ্চা ছিল বটে!

—বা! বেশ, বেশ...তাহলে আজই চলুন...তুজনে খেলা যাবে।

সদানন্দর বয়স প্রায় বাহান্ন বৎসর। স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে আজ দেড় বৎসর। বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে···নাতি-নাতিনী...সৌখীনতার এখনো অন্ত নাই!

দু' দিনেই তিনি শিবশঙ্করকে পাইয়া বসিলেন। অনেক কথা বলিলেন, দুঃখও জানাইলেন। বলিলেন—আপনার ঐ একটি মেয়ে! এবং সে-মেয়ের এখনো বিবাহ হয় নি, তাই। না হলে এ-বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমি যে বেঁচে আছি কি করে, তা আমিই জানি! অথচ হেল্‌থ্ দেখচেন তো! এখনো সকালে উঠে রোজ এক্‌সারসাইজ্ করি। চিরকালের অভ্যাস, তাই দেহখানি আছে পটু!

এবং এমনি কথায়-বার্ত্তায় এক মাস পরে সদানন্দ বলিয়া বসিলেন—আর তো পারা যায় না।...দুটো পাণ খাই...যা-তা সাজা খেতে পারি না, তা সে পাণ সাজতেও এঁদের ভুল হয়! নিজেরা পাণ চিবুচ্ছে অনর্গল, আমি তবু খাবার পরে পাণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। চাইতে চাইতে এ বলে, ওমা, সাজিস্ নি? ও বলে, সেজেছিলুম...কে খেয়েছে আর কি!...তাই ভাবছি, দুত্তোর, পাণ-খাওয়া ছেড়ে দি!···এ নিয়ে বকাবকি করতে ভালো লাগে না, লজ্জা করে!

শিবশঙ্কর কহিলেন—বেশ, আমি আপনার জন্য রোজ পাণ সাজিয়ে পাঠাবো। আমার মেয়ে বেশ ভালো পাণ সাজে...

সদানন্দ কহিলেন,—না, না ... আমার দুটো পাণের জন্য তাঁকে মিছে কষ্ট দেবেন না।

শিবশঙ্কর কহিলেন—আমার জন্য সাজে তো···ও সখটুকু আমারো আছে। যেমন-তেমন পাণ নয়...কেয়া খয়ের চাই, তার পরে কুচি-কুচি-কাটা সুপুরি, ভাজা মশলা,...সে এক সমারোহ ব্যাপার! তা সে-কাজে মেয়ের এতটুকু অবহেলা নেই!

সদানন্দ কহিলেন—ও সখটা আমারো ছিল মশায়...কেয়া খয়ের তিনি তৈরী করতেন। এঁরা সে-পাট জানেন না...জানলেও কে করে সে মেহনৎ? হুঁঃ!...

কথার শেষে সদানন্দ মস্ত বড় একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

রাত্রি ন'টা বাজে। শিবশঙ্কর উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সদানন্দ বলিলেন,—মেয়েরা বিধবা হলে সংসারিক কষ্ট তাঁদের [illegible] পেতে হয় না, যত কষ্ট পায় এই আমাদের মতো পুরুষ-বিধবার দল!

শিবশঙ্কর হাসিলেন।

সদানন্দ কহিলেন—হাসচেন কি! এই তো আমার এতগুলো ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি...মুখের পানে কেউ চেয়ে দেখে না। অবশ্য দেখার মতো দেখা!...সকলে শুষ্ক কর্ত্তব্য-পালন করচেন! [illegible] নেই!... ভাবেনা, আমার জন্যই সব দাঁড়িয়ে আছে!···কি জানেন শিববাবু, এ সব হলো অন্তরের কথা। এ কথা তুলে তর্ক চলে না, কান্নাকাটি করা চলে না···। কাকে কি বলবো? মুখের ওপরে জবাব দেবে··· আমাদের অত সময় কোথায়? অথচ কি যে সব করেন...

শিবশঙ্কর কহিলেন—আজ আসি।

সদানন্দ কহিলেন—চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

শিবশঙ্কর কহিলেন,—না, না, রাত হয়েছে···আপনাকে আর কষ্ট করে বেরুতে হবে না।

সদানন্দ কহিলেন—কোনো কষ্ট হবে না ··হলেও, আপনি এ-কষ্ট রোজ করচেন, আর আমি একদিন করতে পারবো না!

এ কথার পর সদানন্দ ক্ষণেক চুপ করিলেন, তারপর হাসিয়া বলিলেন,—চলুন, পাণের যে বর্ণনা করলেন, আমার লোভ হচ্ছে... আপনার ওখানকার দুটো পাণ খেয়ে আসি···

শিবশঙ্কর কহিলেন—তাহলে আসবেন, বৈ কি···আসুন আমার সঙ্গে।

* * * * *

তারপর শিবশঙ্করের গৃহে সদানন্দ প্রায় নিত্যই আসিতে লাগিলেন। এখানকার চায়ে যে স্বাদ পান, এমন চা তিনি জীবনে পান করেন নাই! সকল দিকে পরিপাটী শৃঙ্খলা···পরিচ্ছন্নতা! সাত মুখে প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়।

সেদিন আসিলেন একেবারে বেলা চারিটার সময়। পুষ্পিতা তখন স্কুলের ক্লাশে গান শিখাইতেছে। শিবশঙ্কর বলিলেন—আসুন...

সদানন্দ বলিলেন—উনি বুঝি এখনো ফেরেন নি?

শিবশঙ্কর বলিলেন—না, আজ ওর গানের ক্লাশ আছে স' চারটে পর্য্যন্ত।

—ও! বলিয়া সদানন্দ বসিলেন।

শিবশঙ্কর কহিলেন—কালোকে চা দিতে বলি।

সদানন্দ বলিলেন—না, উনি আসুন। ওঁর হাতের চা খেয়ে আর কারো হাতে চা খেতে প্রবৃত্তি হয় না! আমি তো সকালে চা খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছি।

গর্ব্বে শিবশঙ্করের বুকখানা দশ-হাত হইল। শিবশঙ্কর কহিলেন,—পুষি চা তৈরী করে, চমৎকার! এই দেখুন না, বসে বসে একটা টেবল

ক্লথ তৈরী করেছে…নক্সায় যে-কাজ করেছে, কোনো প্যাটার্ন দেখে নয়, নিজের মন থেকে গড়েছে।

শিবশঙ্কর টেব্‌ল-ক্লথ আনিলেন। দেখিয়া সদানন্দ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সদানন্দ বলিলেন,—এই মেয়েকে আপনি মাষ্টারির কাজে লাগিয়ে রাখবেন! এত গুণ…তারপরে দেখতে…

যে-উপমা মুখে আসিতেছিল, তাহা প্রকাশ করিতে বাধিল। শিবশঙ্করকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বন্ধুর কন্যা…যে-উপমা মুখের ভাষা প্রকাশ করিতে চায়, সে-উপমা দিতে মন প্রতিবাদ তুলিল! মনে যে-ভাব…সে-উপমা যেন কেমনতরো শুনাইবে, অথচ মানানসই উপমা দিতে গেলে বলিতে হয়, 'মা-লক্ষ্মী'! সে কথা বলিতে প্রাণের কোথায় চাড় লাগে!

অর্থাৎ পুষ্পিতাকে দেখিয়া মনের কোণে আগাছা ঠেলিয়া আবার পুষ্পকুঞ্জ রোপণ করিতে বাসনা জাগে! পুষ্পিতা যদি লেখা-পড়া না জানিত, মনের এ-বাসনা শিবশঙ্করকে খুলিয়া বলিলে হয়তো তার পরিপূরণ সম্ভব ছিল! কিন্তু এ-সব মেয়ে…লোকের মুখে শুনিয়াছেন, বইয়ে পড়িয়াছেন…ভয় হয়, ফোঁশ করিয়া উঠি[illegible]! তবু… নিরাশ হইলে চলিবে না। উর্ণনাভের মতো প্রীতির সূত্রে শিবশঙ্করকে তাই বিজড়িত করিতেছিলেন! বিজড়িত করিতে পারিলে হয়তো কোনো দিন…

শিবশঙ্কর কহিলেন,—বিয়ে দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। অনেক টাকার মামলা।

সদানন্দ বলিলেন,—এমন মেয়ের বিয়েতেও টাকা দিতে হবে?

শিবশঙ্কর বলিলেন,—দিতে হয় বৈ কি! নিয়ম!

সহসা দারুণ উষ্মা প্রকাশ করিয়া সদানন্দ বলিলেন—তাইতো বলি কংগ্রেস কংগ্রেস—ভোট-ভোট ক'রে দেশে কি উপকারটা করচো বাপু? দুটো চাকরি! আরে, কন্যাদায়ের ভারে মানুষ যে পিষে মারা যাচ্ছে, আগে সে দায় থেকে তাদের বাঁচাবার উপায় করো! দুটো ভোটে দেশের লোকের কন্যাদায় ঘুচবে না তো! বলে, মেয়েদের অবহেলা করো না, মেয়েদের দাও পুরুষের সঙ্গে সমান আসন, সমান অধিকার! হুঁঃ, মেয়ের বিয়ে দিতে মেয়ের বাপকে পিষে টাকা নাও কেন তবে? ছেলে বিয়ে করচে—ছেলেও পয়সা দিক্! এ-কাজ করো যে বুঝি, দেশের লোকের সত্যিকারের উপকার করা হবে, তারা প্রাণে বাঁচবে!

শিবশঙ্কর কহিলেন,—লেখাপড়া কালচার যতই হোক, এদিকে কারো দরাজ ছাতি দেখছি না। না ছেলের বাপের, না ছেলেদের নিজেদের!

সদানন্দ বলিলেন,—কবিতা লিখে মেয়েদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন ছোকরা-কবির দল! কিন্তু সেই মেয়েদের বিয়ে করবার সময় মেয়ের বাপের হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে টাকা বার করতে একেবারে ডাণ্ডাধারী হয়ে ওঠেন!

কথায় কথায় বাঙালীর বিবাহ-প্রথার উপরে সদানন্দ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—এ দায় ঘুচোবার একটী মাত্র উপায় আছে...

শিবশঙ্কর কৌতূহল-বশে প্রশ্ন করিলেন,—কি উপায়?

সদানন্দ বলিলেন,—মেয়েরা পণ করুক, যেখানে যৌতুক চাওয়া-পাওয়া আছে, সে-ধার তারা মাড়াবে না—তা হলেই তাদের ইজ্জতের দাম বাড়বে!...কিন্তু সে কথা যাক, আপনার মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধে কখনো আপনি চিন্তা করেছেন?

শিবশঙ্কর কহিলেন,—করেচি কি! ও চিন্তা এখন আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধে আছে অহরহ!

একটা ঢোক গিলিয়া সদানন্দ প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা, আমি সন্ধান করবো। কি রকম পাত্র আপনি চান?

শিবশঙ্কর কহিলেন,—শিক্ষা-দীক্ষা থাকা চাই সব আগে। আমার মেয়ের চেয়ে লেখাপড়ায় সরেস হওয়া চাই। বাপের টাকা-কড়ি জমিদারী না থাকুক, ছেলের রোজগারের শক্তি-সামর্থ্য এবং সম্ভাবনা থাকবে, স্বাস্থ্য আর স্বভাব হবে ভালো—গোঁয়ার-গোবিন্দ বা উড়নচণ্ডী হবে না!

সদানন্দ বলিলেন,—বয়স?

শিবশঙ্কর বলিলেন,—বয়স হওয়া চাই মানানসই—অর্থাৎ মেয়ের চেয়ে বয়সে এমন বড় হবে না যে মেয়ে তার নাগাল পাবে না!

সদানন্দর বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল—কাশির দমক আসিল। কাশিয়া গলা সাফ করিয়া তিনি শুধু বলিলেন—হুঁ!

স্কুলের ঘরে পুষ্পিতা গান শিখাইতেছিল। গাহিতেছিল—

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে
অনেক দূরে গেছে বেঁকে!
আমার ফুলে আর কি কবে
তোমার মালা গাঁথা হবে?
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায়
কেঁদে বাজে কারে ডেকে...

শিবশঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিলেন, সদানন্দ বলিলেন,—চুপ...

সদানন্দ গান শুনিতে লাগিলেন। মন বলিতে লাগিল, তাই কি? পুষ্পিতার চলার পথ সদানন্দর পথের থেকে সত্যাই অনেক দূরে বাঁকিয়া গিয়াছে? পুষ্পিতার মনের ফুলে গাঁথা মালা মনের মধ্যে ঢেউয়ের রাশি—সে ঢেউয়ে দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে···

পুষ্পিতা গাহিতেছিল,

পথিকরা যায় আপন-মনে॰
আমারে যায় পিছে রেখে।

সদানন্দর মন বলিতে লাগিল, এ পথিক—কারা? কারা? কাহাকে পিছনে রাখিয়া চলিয়া যায়? পুষ্পিতাকে? আশ্চর্য্য!...পুষ্পিতাকে পিছনে রাখিয়া যাইবে, এমন পথিক পৃথিবীর পথে আছে না কি?

বিজু আসিয়া পুষ্পিতার গৃহে পুষ্পিতার দেখা পাইল না, তাহাতে তার বুক একেবারে দশ হাত বসিয়া গেল। সে খপর পাইল, এখানকার বাস তুলিয়া শিবশঙ্কর বাবু মেয়েকে লইয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। এ-কথাও শুনিল, দেনার দায়ে বাড়ী বিকাইয়া গিয়াছে। পয়সা-কড়ির অত্যন্ত টানাটানি, তাই পাঁচজনের কাছে উঁচু মাথা হেঁট হইবে আশঙ্কায় শিবশঙ্কর স্বপ্নের মতো এখান হইতে সহসা অদৃশ্য হইয়াছেন!

বিজু সমস্যায় পড়িল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সে দেখিয়াছে, বাড়ীর সামনে ওদিককার ফুটপাথে শুভেন্দু বসিয়া আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মলিন বেশ—কিন্তু দুচোখে বিদ্যুতের অগ্নিশিখা!

মায়ের কাছে এ-কথা বলিবে, উপায় নাই! মায়ের যে-শরীর, একটুতেই বুক-ধড়ফড় করিয়া অজ্ঞান হইবার জো! বাপকে বলিলে কোনো কথা কাণে তোলে না। কাণে যদি বা এ-কথা যায়, তখনি আইন-কানুনের মঞ্চে চড়িয়া দুনিয়ার কাণ মলিয়া চাবুক মারিবার জন্য গর্জ্জন করিবে। তাহাতে পরিত্রাণ মিলিবে না! ফলে পাড়ায় একটা বিশ্রী কলরব পড়িয়া যাইবে।

বুদ্ধি করিয়া ইশারায় সে শুভেন্দুকে জানাইল, এখনি সে বাহির হইবে, শুভেন্দু যেন নিঃশব্দে তার অনুসরণ করে।

এবং এমনি করিয়া শুভেন্দুকে ল্যাং-বোটের মতো পিছনে লইয়া বিজু আসিল বড় পার্কের মধ্যে। নিরালা জায়গা মিলিবা মাত্র শুভেন্দুকে সে বলিল—কেন তুমি আমার পিছনে এমন করে ঘুরচো?

আমার জীবনটাকে তুমি নষ্ট করে দিতে চাও···এই তোমার ভালোবাসা ?

শুভেন্দু বলিল,—আমার জীবনের পানে তুমি চেয়ে দেখেছো ?

বিজু বলিল,—ছেলেবেলায় জ্ঞান-বুদ্ধি হয়নি...যদি একটা ভুল করে থাকি, তার জন্ম আজীবন সেই ভুলকে শিরোধার্য্য করে চলতে হবে ?

শুভেন্দু কহিল,—ভুল ?

বিজু কহিল,—তাই। আমি বলচি, তোমাকে আমি বিয়ে করবো না! তোমায়-আমায় মিলে সংসার করা সম্ভব নয়...তবু তুমি আমার আশা ছাড়বে না ?

শুভেন্দু বলিল,—তুমি খুব পণ্ডিত হয়েছো, অনেক বই পড়েছো, জানি। কিন্তু......

বাধা দিয়া বিজু বলিল,—আমার উপরে যদি এত টান, তাহলে এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলে কেন ? এর আগে এসে এ-কথা বলতে পারোনি ?...তাছাড়া আমাকে বিয়ে করে এ অবস্থায় তোমার লাভ ? আমার বাবার এমন পয়সা নেই যে তোমাকে তিনি পুষবেন! মানুষ বিয়ে করে আরামে সংসার করবে বলে—এক্ষেত্রে সে আরামের কোন আশাই দেখছি না—না তোমার দিকে, না আমার দিকে...

শুভেন্দু বলিল,—বিয়ে করতেই হবে, সে-কথা কে বলচে ? তুমি যদি বলো...

বিজু রুখিয়া উঠিল,—সাবধান হয়ে কথা বলো শুভেন্দু!. পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে আমি অনেকখানি সহ্য করেছি। যা না সয়বার, তাও সয়েছি। কিন্তু এভাবে ফের যদি তুমি একটা অপমানের কথা বলো......

ক্রোধে রোষে বিজুর শরীর কাঁপিতেছিল..

শুভেন্দু বলিল,—কি তুমি করবে, শুনি?

বিজু বলিল,—চীৎকার করে লোক ডাকবো...

শুভেন্দু বলিল—তাদের সামনে আমি আমাদের পুরোনো বন্ধুত্বের কথা খুলে বলবো।...

এ-কথায় বিজু ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া [illegible]।

শুভেন্দু কহিল—তোমার মুখে কেতাবের বড় বড় কথা শোভা পায় না বিজু। আমি যখন বাসায় থেকে লেখাপড়া করতুম, তখন আমি গরীব হলেও আমার স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল...হয়তো ভালোই থাকতুম, যদি তোমার দিক থেকে প্রশ্রয় না মিলতো! আমার সঙ্গে কেন তুমি যেচে মিশতে এসেছিলে? ভালো গান গাই...তাই? গান মানুষ শোনে—গান মানুষের ভালো লাগে, মানি। তা বলে যে গান গায়, তাকে কেউ গ্রাস করতে চায় না।...আমাকে আজ বদমায়েস বলে তুমি গালাগাল দিচ্ছ...কিন্তু যখন আমার কাছে গান গাইতে আসতে, তুমি ডাগর মেয়ে... আমি কোথাকার কাদের ছেলে...বাড়ী-ঘর আছে কি-না, সে খপরও নিলে না...তোমার মা-বাবা কি বলে তোমার মত ডগের মেয়েকে আমার কাছে ছেড়ে দিলে, ভেবে আমি অবাক হয়েছিলুম! তারপর গান শেখবার সময় তোমার হাত ধরলুম...তুমি তো তখন চমকে ওঠোনি!... এ অন্তরঙ্গতা তুমি যেন চাইছিলে!...তাই থেকে আমি বুঝলুম, নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্য তুমি তৈরী!...আমার সঙ্গে তুমি যেতে সিনেমায়, মাঠে, রেস্তোরাঁয়। তোমার মা-বাবা একদিনের জন্য আপত্তি তোলেননি! আমাকে ভোলাবার জন্য এর বেশী আর কি আয়োজন করতে পারতে? ...শেষে তোমারি জন্য আমার লেখাপড়া গেল চুকে!

চোখ রাঙাইয়া বিজু বলিল—আমার জন্য?

শুভেন্দু বলিল,—তাই। তোমার বাবা আমাকে, তোমার যোগ্য মনে করলেন না—তার কারণ, আমার তেমন পয়সা-কড়ি ছিল না। যদি পয়সা থাকতো, তাহলে আমি শুভেন্দু না হয়ে যদি রামা মুচি হতুম... তোমার বাবার আপত্তি উঠতো না! তোমার বাবা তোমার কাছে যত শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র, হোন...আমি তাঁকে চিনি।...এই অক্ষয়... সে যে তোমাদের বাড়ী এমন জামাই-আদর পায়, তার কারণ,সে দু'হাতে তোমাদের বাড়ী পয়সা বিলোয়.:.অথচ তোমাকে আরামে রাখবার জন্য আমি যা করবো, অক্ষয় তার সিকির সিকিও করবে না।... আমার সঙ্গে মেলামেশা করেছিলে...আমার ব্যবহারে কোনোদিন তুমি এতটুকু খেয়ালের পরিচয় পেয়েছিলে? বলো...বলো তুমি...বলতেই হবে...

কথাগুলা বিজু মন দিয়া শুনিল...কোনো কথার প্রতিবাদ তুলিতে পারিল না।...কিন্তু শুভেন্দু যাহাই বলুক ... না ... না... ঐ মূর্ত্তি... শুভেন্দু ট্যাক্সি হাঁকায়! বিজু সমাজে বাস করে! সমাজে আর-পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছাঁটিয়া দিয়া শুভেন্দুর ভালোবাসা লইয়া বাস করা চলে না!

মনে হইল, ভালোবাসা...মানুষ চমৎকার একটা ফাঁকির কথা বানাইয়া রাখিয়াছে! অথচ ভালোবাসার অর্থ যে কি, আজও তাহা বুঝা গেল না! মুখোমুখি বসিয়া সোহাগের কথা বলা যদি ভালোবাসা হয়, তবে সে ভালোবাসার কাঙাল বিজু কোনোদিন ছিল না...কোনোদিন হইবে না।

দেহ?...দেহের ক্ষুধা মানুষের ক'দিন থাকে? দেহ লইয়া ভালোবাসার বড়াই চলে না! তার প্রমাণ, কালো কুরূপ, মোটা দেহপিণ্ডগুলা! ঐ দেহ লইয়া নারীর প্রাণের দ্বারে তারা কোনো দিন তাহা হইলে ঠাঁই পাইত না! ভালোবাসার অর্থ বিজু বুঝিয়াছে—যদি ভালোবাসো, আমায়

সুখে রাখো...কোনোদিকে যেন আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বা বেদনা না বোধ করি! এইটাই আসল ভালোবাসা!

সে ভালোবাসা দিবে শুভেন্দু?...অসম্ভব!

বিজু কোনো জবাব দিল না। তার মন তখন চিন্তার তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত! জবাব দিবার শক্তি ছিল না।

শুভেন্দু বিজুর পানে চাহিয়াছিল...পাষাণে বুক বাঁধিলেও বিজু সুন্দর! যে-মূর্ত্তি দেখিয়া শুভেন্দু প্রথমে ভুলিয়াছিল, তার চেয়েও আজিকার এ-মূর্ত্তি অনেক বেশী মনোবিমোহন!

শুভেন্দু বলিল—বলো...আমার কথার জবাব চাই।

বিজু কহিল—জবাব যদি না দি?

শুভেন্দু বলিল—আমি আজ জবাব নেবোই। ভালো কথায় জবাব না পাই...

বিজু কহিল—গায়ের জোরে? দেখি, কতখানি তোমার গায়ের জোর...

কথাটা বলিয়া বিজু শুভেন্দুর সামনে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল।

শুভেন্দু চারিদিকে চাহিল...পার্কে লোক-জন আছে...দূরে! তা হোক ...বেশী দূরে নয়!

শুভেন্দু হাসিল, হাসিয়া বলিল—সে জোর যদি চালাতে হয় তো এখানে নয়...সে জোর চালাবার জায়গার অভাব হবে না! এখানে বাড়ীর কাছে বলে তোমার এতখানি সাহস হয়েছে...কিন্তু বাড়ী থেকে দূরে কোনোদিন তোমার সঙ্গে একেবারে দেখা হবে না, তা ভেবো না। সেদিন যদি জবাব আদায় করি...

সহসা বিজুর চেতনা হইল। এ সে কি করিয়াছে! নরম হইয়া মিনতি জানাইতে আসিয়া রাগিয়া বকিয়া ইহাকে আরো তাতাইয়া তুলিয়াছে! না...না...

তখনি কণ্ঠস্বর কোমল মৃদু করিয়া বিজু বলিল—একটা কথা আছে ...আগে সে কথার জবাব তুমি দাও...

শুভেন্দু কহিল,—বলো···

বিজু কহিল—আমি বলবো, আমাকে তুমি ভালোবাসো...যদি সে সত্যিকারের ভালোবাসা হয়, তাহলে তোমার উচিত, যাতে আমি সুখে থাকবো, যাতে আরাম পাবো, তাই করা...নয় ?

শুভেন্দু কহিল,—আমি জানি, আমার চেঁয়ে কেউ তোমাকে সুখী করতে পারবে না ..কেউ তোমাকে আরামে রাখবে না...

বিজু বলিল—তুমি ট্যাক্সি চালাও...কি তোমার এমন সংস্থান...

বাধা দিয়া শুভেন্দু বলিল—টাকাটাই সব-চেয়ে বড় জিনিষ নয়, বিজু...

বিজু বলিল—আমার কাছে টাকাই সবার বড়। টাকা না থাকলে মানুষ আরাম পায় না...এর ওপরে তোমার কোনো কথা বলবার আছে ?

শুভেন্দু হাসিল ; হাসিয়া স্থির দৃষ্টিতে বিজুর পানে চাহিয়া রহিল। নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। এই বিজু...এখনো সে ইহার ধ্যানে পাগল ...ইহাকে না পাইলে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না ?

বিজু বলিল—তবু যদি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাও...তা যেন পারলে...কিন্তু আমাকে রাখতে পারবে না...

শুভেন্দু এবারো কোন কথা কহিল না ; তেমনি অবিচল দৃষ্টিতে বিজুর পানে চাহিয়া রহিল।

বিজু কহিল—কি দেখচো আমার পানে চেয়ে ? আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কখনো একদিন হয়তো একটু মমতা ছিল...কিন্তু সে মমতা তুমি ঘুচিয়ে দেছ তোমার আচরণে !

শুভেন্দু হাসিল, হাসিয়া বলিল—তোমার লজ্জা হচ্ছে না এ কথা বলতে? ভদ্রঘরে জন্মে কোথাকার অজানা পুরুষের কাছে যে-সব চিঠি লিখেচো...তা ছাড়া জনে-জনে এমনি করে বিকিয়ে বেড়ানো... নিরাপদ আরাম-নীড়ের সন্ধানে...আমাকে তুমি বলো, বন্ধ!...তবু তোমার মত আমি জনে-জনে ভালোবাসা জানিয়ে বেড়াইনি। তোমায় পাবো বলে টাকার চেষ্টায় আমি কি না করেছি! ট্যাক্সি-ড্রাইভারের বেশে এসেছি আজ···কিন্তু আমি ট্যাক্সি হাঁকাই না সত্যি!... দু'খানা ট্যাক্সির আমি মালিক। ট্যাক্সি আমি হাঁকিয়েছি একদিন... আজ হাঁকাই না।...তুমি ঘৃণা করো ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে! কিন্তু তুমি নিজে কী—একবার ভেবে দেখো। নিজের পরিচয় নিজে নেবার চেষ্টা করো।...আজ এখানে লোক-জন আছে...না হলে নিজের হাতে তোমার আচরণের শিক্ষা দিয়ে যেতুম! ভেবো না, এ শিক্ষা তুমি পাবে না কোনো দিন—এ শিক্ষা তোমাকে পেতেই হবে—আজ হয়তো তা তোলা রইলো।

শুভেন্দুর কথা শুনিয়া বিজুর ভয় হইল। বিজু বলিল,—আমার মিনতি...

শুভেন্দু কহিল,—কি মিনতি? বলো···

বিজু বলিল,—আমার হয়তো দোষ হয়েছিল। কিন্তু তুমি পুরুষ মানুষ... তোমার জীবনে লক্ষ পথ খোলা। আমার অনিষ্ট তুমি করো না... লক্ষীটি!

শুভেন্দু কহিল,—তোমার অনিষ্ট তুমি নিজেই করবে। তবে তোমার কাছে যে শিক্ষা পেলুম, তাতে তোমার মতো চালের মেয়েদের উপরে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। ঘরে তোমার ছোট বোন আছে···তাদের একটু দেখো...তারা যেন তোমার মতো প্রজাপতি-ব্রত

না নেয়! তাতে তাদের মঙ্গল না হোক, আমার মতো গাধা পুরুষগুলো বেঁচে বর্ত্তাবে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শুভেন্দু একটু সরিয়া গেল। পায়চারি করিতে লাগিল। বিজু ভাবিল, এই সুযোগে সে পলাইয়া যাইবে?

কিন্তু হঠাৎ দিনের আলোয় পলাইতে দেখিলে লোকে কি ভাবিবে? লোকের চোখের অন্তরালে সে কোনো কিছুর ভয় করে না—কিন্তু লোকের চোখের সামনে...

ইজ্জত থাকিবে না!

বিজু বলিল,—তা হলে আমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারি?

শুভেন্দু বলিল,—যাও—তবে নিশ্চিন্ত হতে পারবে কি না তার বোঝাপড়া করো তোমার মনের সঙ্গে। বিলিতি একটা ছবি দেখেছিলুম—A Girl with a past—এ রকম মেয়েদের ভাগ্যে ভগবান সুখ বা আরাম লেখেন না বলেই আমার বিশ্বাস!

শুভেন্দু বিদায় লইলেও বিজুর মনের ছম্‌ছমানি গেল না। সে কি চায়, আজ তা বুঝিয়াছে স্পষ্ট রকম!

এ কথা লইয়া বিজু অনেক ভাবিয়াছে। সে অনেকের সঙ্গে মিশিয়াছে। শুভেন্দুর সঙ্গে মেলামেশা...পুরুষের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়! পুরুষ তখন কামনার মণি! সে-বয়সে পুরুষের মুখের দুটা মিষ্ট কথা, একটু আদর-সোহাগ পাইলে মনে হইত, ইহার চেয়ে বড় পাওয়া আর জগতে নাই। কিন্তু সে পাওয়ায় মন খুশী থাকিতে পারিল না। তার পাওয়ার সীমা এটা ছাড়িয়া ওটা টপ্‌কাইয়া নানা দিকে ছুটিয়া চলিল! সে চলার বেগে মনকে বুঝানো দায়। তাই শুভেন্দু চাওয়া-পাওয়ার অন্তরালে চলিয়া গেলে বিজুর নিরুপায় মন চারিদিকে তাকাইতে লাগিল আপনার শূন্যতা ভরিয়া তুলিবার জন্য। এবং সামনে তখন যাহাকে পাইয়াছে, তাহাকে দিয়াই মনের নিঃসঙ্গতা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতায় সে পুরুষের পরিচয় পাইয়াছে দেওয়া-নেওয়ার তৌলে ওজন করিয়া। [illegible] কৃপণ, গ্রহণে নিপুণ এমন পুরুষের সঙ্গ দুদিন পরে ত্যাগ [illegible]য়াছে। তার পর চোখের উপরে এই ঘূর্ণ্যমান বিশ্ব-নিখিল তার দুর্লঙ্ঘ্য ঘূর্ণন-বেগে আনিয়া দিয়াছে কত আরাম কত সুখ কত নিরাশা, কত অশ্রু! তাই নিজের পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়াই এই সব আরাম-সুখের সে হিসাব কষিয়াছে এবং হিসাবে যতদূর পাইয়াছে, অক্ষয়কেই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়া মনে হইয়াছে। অক্ষয়কে আজ ছাড়া যায় না! অক্ষয়কে ছাড়িলে ভবিষ্যতের অনেক আশা ছাড়িয়া দিতে হয়।

এমনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বিজু বাড়ী গেল না; সামনে চলন্ত ট্রাম দেখিয়া সেই ট্রামে চড়িয়া বসিল এবং ট্রাম আসিয়া যখন গঙ্গার ধারে ইডন্ গার্ডেনের পাশে থামিল, তখন সে ট্রাম হইতে নামিয়া আন-মনে ইডন্ গার্ডেনে প্রবেশ করিল।

বেলা নটা বাজিয়া গিয়াছে। সৌখীন নর-নারীর দল হাওয়া খাইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। বিজু আসিয়া একটা নিরালা বেঞ্চে বসিল। মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা তখনো মৌমাছিদের মতো গুঞ্জন তুলিয়া ছুটিয়াছে···তারা বিজুকে ত্যাগ করে নাই।

চিন্তায় এমন তন্ময় যে কাছের বেঞ্চে দুজন ভদ্রলোক কখন আসিয়া বসিয়াছে, সে দিকে হুঁশ ছিল না। সহসা শুনিল শিবশঙ্করের নাম...

ভদ্রলোকরা শিবশঙ্করের আকস্মিক উঠিয়া যাওয়ার কথা বলিতেছিল। ভদ্রলোক দুজনের বয়স তরুণ।

একজন বলিল,—আগের দিন গিয়ে দেখা করেছি ঘুণাক্ষরে বলেননি, কলকাতা ছাড়বেন। তখন বিষয়-আশয় গেছে—তবু একদিনও এখানে থাকা যাবে না, এমন অবস্থার কথা জানতে পারিনি। তাঁর মেয়ে পুষ্পিতাও ঘুণাক্ষরে এ-ব্যাপারের আভাস দ্যায়নি।

অপর ভদ্রলোক বলিল,—কোনো সন্ধান পেলে · কোথায় গেছে?

প্রথম বলিল—না। সন্ধান করেছি ঢের।

দ্বিতীয় বলিল—পোষ্ট-অফিসে সন্ধান নেছ? ঐটি হলো সন্ধানের পক্ষে সবচেয়ে নির্ভুল জায়গা। যাবার সময় চিঠিপত্র সম্বন্ধে পোষ্ট অফিসে মানুষ ব্যবস্থা করে যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে বিজুর গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল। এ অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর...ভুল নাই। এ-স্বর তার কানে বাজিতেছে, মনে বাজিতেছে অহর্নিশি...সুরলোকের সঙ্গীতের মতো!

পত্র-পল্লবের অন্তরাল হইতে সতর্ক দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া বিজু দেখিল। দেখিল, তার অনুমান ভুল হয় নাই। অক্ষয়ই। তার পাশের ভদ্রলোকটি…?

চিনিল। নীলাদ্রি। পুষ্পিতার ওখানে কতদিন দেখিয়াছে! আলাপ হয় নাই, তবে তাকে দেখিলে নীলাদ্রির চিনিতে বিলম্ব হইবে না।

বিজু কি করিবে? দেখা দিবে? পুষ্পিতার সংবাদ লইবে?

কিন্তু অক্ষয় যদি বলে, হঠাৎ এখানে কেন?

বলিবে, বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।

যদি বলে,—এত বেলা অবধি বসিয়া আছো?

বলিবে,—ভালো লাগিতেছে বলিয়া বসিয়া আছি।

তাই করি, এ নিঃসঙ্গতায় ভাবনা যেন পাষাণের মতো বাড়িয়া ভারী হইয়া উঠিতেছে!

বিজু বাহিরে আসিল। যেন তাদের লক্ষ্য করে নাই, এমনি ভঙ্গী!

অক্ষয় চমকিয়া উঠিল। কহিল,—Hallo ··তুমি!

বিজু বলিল,—আপনি!

অক্ষয় চাহিল নীলাদ্রির পানে। কহিল,—এর কথাই বলছিলুম তোমাকে।

নীলাদ্রি কহিল,—বটে!

নীলাদ্রি বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাথা নোয়াইয়া বলিল—নমস্কার!

সহাস্যে বিজু বলিল—নমস্কার!

অক্ষয় কহিল—হঠাৎ এখানে...একলা?

বিজু কহিল—বেড়াতে এসেছিলুম।

অক্ষয় কহিল—একলা ?

বিজু কোন কথা বলিল না···লজ্জার রাঙা আভায় তার মুখ রাঙিয়া উঠিল।

অক্ষয় কহিল—কাল তোমাদের ওখানে যেতে পারিনি আমার এই বন্ধুর পাল্লায় পড়ে।

হাসিয়া নীলাদ্রি কহিল—কেন প্রথম পরিচয়েই আমার উপর ওঁর বিরাগ সঞ্চার করচো ?......মানে, অক্ষয় আর আমি ছেলেবেলায় পড়েছিলুম এক-ক্লাশে। তারপর ঘটনা-চক্রে আমাকে হেয়ার স্কুল ছেড়ে পশ্চিমে যেতে হলো···কলকাতায় ফিরেছি বহুকাল···নানা কাজে নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে...আলাপ-পরিচয় হয়েছে কত নতুন লোকের সঙ্গে, কিন্তু এক-সহরে বাস করেও দুজনের সঙ্গে দুজনের কোনোদিন দেখা হয়নি। দেখা হলো ঠিক পাঁচদিন আগে...এখনো এক হপ্তা পূর্ণ হয় নি।

অক্ষয় বলিল—কিন্তু এই পাঁচদিনে দুজনে দুজনকে দুজনের কথা যা বলেছি, বোধ হয়, পাঁচ বৎসরেও মানুষ এত কথা বলে শেষ করতে পারে না। কিন্তু আর বেশী কথা বলবার আগে আমার বন্ধুর নামটি বলে রাখি। এর নাম নীলাদ্রি—আর নীলাদ্রিকে বলি তোমার নাম... এঁর নাম কুমারী শ্রীমতী বিজয়া দেবী। আমরা ডাকি বিজু বলে। এবং এই বিজুই...

বিজু লজ্জায় মাথা নত করিল।

নীলাদ্রি কহিল—তোমার সঙ্গে এবারে দেখা হবার আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে অনেকবার...শিবশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে। উনি পুষ্পিতার বন্ধু···নয় ?

বিজু এ পরিচয়ে গর্ব্ব বোধ করিল। শিবশঙ্কর বাবু আজ নিঃস্ব হইলেও তাঁর নাম কলিকাতা-সহরে কাহারো অবিদিত নয়।

বিজু বলিল—শিবশঙ্কর বাবুরা এখানে নেই...

নীলাদ্রি বলিল—কথায়-কথায় সেই কথাই হচ্ছিল...

বিজু বলিল—আপনিও জানেন না তাহলে তাঁরা কোথায় গেছেন? শুনেছিলুম, পশ্চিমে কোথায় যাবার কথা হচ্ছে...যেদিন চলে গেছে, তার আগের দিন আমি গিয়েছিলুম পুষ্পিতার কাছে···অনেক কথা হলো। কথা ছিল, পরের দিন তার কাছে আবার যাবো···কিন্তু তখন বলে নি যে ওরা এখানে থাকবে না! পরের দিন গিয়ে দেখি, বাড়ী খালি।

নীলাদ্রি কহিল—মস্ত বড় ট্রাজেডি! জিনিষ-পত্র নীলামে বিক্রী হচ্ছে, এমন সময়ে আমি গেলুম...তা আমার কাছে সে কথা বললেন না···। হয়তো এ-দায়ে পুরোপুরি না হোক কিছু সাহায্য আমি করতে পারতুম।... যেচে কোনো দিন এ-কথা বলতে পারেননি, তার কারণ সর্ব্বস্ব গেলেও শিবশঙ্কর বাবু মান খোয়াতে পারতেন না!

বিজু কহিল—পুষ্পিতাও ঠিক সেই রকম...

নীলাদ্রি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অজ্ঞাত-বাস···এ আমি কখনো কল্পনা করিনি।

অক্ষয় বলিল—আপনার জনের কাছে এ-পতনে মুখ দেখানো আরো কঠিন হয়। যে চেনে না জানে না, তার কাছে মান নেই, লজ্জাও নেই।

নীলাদ্রি বলিল,—ও কথা যাক্! তুমি তা হলে বেলা ছুটোয় আস্চো অক্ষয় আমার অফিসে?

অক্ষয় কলিল—নিশ্চয়।...

নীলাদ্রি কহিল—তুমি যাবার উদ্যোগ করচো এখন।···আমি এখানে আর একটু বসবো। সিম্পশন সাহেব আসবে শিবপুর থেকে...এইখানে দেখা করবার কথা। সে যাবে কোর্টে...

অক্ষয় কহিল—বেশ, তুমি ইতিমধ্যে সিম্পশনের সঙ্গে কথা কও... তোমার অফিসে আমি রিপোর্ট পাবো'খন...

এ কথার পর অক্ষয় চাহিল বিজুর পানে, কহিল,—আমার গাড়ীতে তুমি আসতে পারো...তোমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

বিজু বলিল—চলুন।

বিদায় চাহিয়া অক্ষয় আসিল পথে। বিজু তার সঙ্গে আসিল। দুজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। টু-শীটার গাড়ী। অক্ষয় গাড়ী চালাইতেছিল...

রেড রোডে সেনোটাফের ধার পর্যন্ত গাড়ী আসিল—দুজনে চুপচাপ! কাহারো মুখে কথা নাই!

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অক্ষয় কহিল,—চুপচাপ আছো যে! কথা কইচো না...এর কারণ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিজু কহিল—কি কথা বল্‌বো?

—কোনো কথা নেই?

শুভেন্দুর কথা বিজুর মনে লাঠি-ঘাড়ে উদয় হইল, একেবারে মার-মূর্ত্তি ধরিয়া।

অক্ষয় কহিল,—কি ভাবচো?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিজু কহিল,—কথাটা আপনার কাছ থেকে শুনবো ভাবছি।

অক্ষয় কহিল—কি কথা?

বিজুর বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। যেভাবে আজিকার দিন উদয় হইয়াছে, বিজুর মন ভারী হইয়া আছে···

অক্ষয় কহিল,—আজ তোমাকে বড় গম্ভীর দেখছি।

বিজু কহিল—হ্যাঁ...

তার স্বর গাঢ়।

গাড়ী আসিল পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে...

বিজু কহিল,—আমাকে এইখানেই নামিয়ে দিন...

অভিমানের শিখা তার মনকে তখন বেশ তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে...

ট্রাফিক-পুলিশ পথ বন্ধ করিয়াছিল, অক্ষয় গাড়ী থামাইল...কহিল,—কি হয়েছে বিজু?

বিজু জ্বলিয়া উঠিল...দপ্ করিয়া...অকস্মাৎ! কহিল,—আপনার সঙ্গে কি কথা ছিল? অমন করে' মিথ্যা আশা দিয়ে কেন আমাকে ঘোরাচ্ছেন?

—আশা!

বিজু কহিল—নয়? বললেন, আপনি ধর্ম্ম মানেন না, সমাজ মানেন না...আমাকে...

বিজু আর বেশী বলিতে পারিল না। ক্ষোভ, অভিমান, আবেগ তার কণ্ঠ যেন সবলে চাপিয়া ধরিল।

অক্ষয় কহিল—ও! বিয়ের কথা বলচো!...কিন্তু বিয়ের কথা কয়ে অবধি আমি অনেক কথা ভাবছি বিজু।...আর দু' একদিন আমাকে ভাবতে দাও...

বিজু কহিল—কাশানোভায় গিয়ে, সিনেমায় গিয়ে, মোটর-ড্রাইভ করতে গিয়ে এ-সব কথা মনে হয়নি বুঝি? আমার মনকে কায়দা করে বাগিয়ে নিয়ে এখন নতুন করে কি কথা ভাবতে বসেছেন যে...

ট্রাফিক-পুলিশ হাত সরাইয়াছে...অক্ষয় গাড়ী চালাইল...জবাব দিল না।

বিজু বলিল—আমি এইখানে নামবো...

অক্ষয় কহিল—হঠাৎ এ খেয়াল?

বিজু বলিল—আপনি যদি হঠাৎ আজ নতুন কথা ভাবতে বসেন, আমারি বা নামবার খেয়াল কেন না হবে ?...থামান গাড়ী...

শেষের দিকে বিজুর স্বর বেশ সুদৃঢ় কঠিন···

বিজু বলিল,—আমি যাবো না আপনার গাড়ীতে। দয়ায় দানে, ভিক্ষায় আমার অরুচি ধরে গেছে !...গাড়ী থামান...না থামালে আমি চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়বো...

বিজুর রুদ্র-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া অক্ষয়ের ভয় হইল। বিজুকে সে জানে···এ-সব মেয়ের স্বভাব তার অবিদিত নয়।

অক্ষয় গাড়ী থামাইল,—বিজু নামিল।

অক্ষয় কহিল—জানি না, কেন তুমি রাগ করছো! তুমিও একটু ভেবে দেখো...মানে, আজ দুদিন আমার মনে একটু পরিবর্ত্তন এসেছে...

বিজু দাঁড়াইল না; উত্তর দিবার কোনো চেষ্টা করিল না; গাড়ী হইতে নামিয়া সে সোজা চলিল চৌরঙ্গীর পশ্চিম দিকে...ট্রাম ধরিবার জন্য...

অক্ষয় বিস্মিত হইল। তারপর গাড়ী চালাইয়া পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া সোজা সে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইল।

১৬

দু' দিন প্রচণ্ড বর্ষা নামিয়াছে । দিনে-রাতে এক বিরাম নাই গলি-পথ জলের নীচে ঢাকিয়া জলে জলময়। মেয়েরা স্কুলে আসিতে পারে না। স্কুল বন্ধ।

সন্ধ্যার সময় শিবশঙ্কর বলিলেন—আর তো পারা যায় না, মা ছোট্ট খাঁচার মধ্যে পড়ে থেকে থেকে প্রাণটা ভেপসে উঠেছে।

পুষ্পিতা বসিয়া সেলাই করিতেছিল, কহিল—পৃথিবী যেন কোথায় সরে চলে গেছে,...না ? আমার কিন্তু মন্দ লাগছে না বাবা...

শিবশঙ্কর বলিলেন—একটু ঘুরে আসি । কি বলিস মা ?...সদানন্দ বাবুর বাড়ীতে একবার...

হাসিয়া পুষ্পিতা কহিল—খেলার জন্যে মন অস্থির হয়ে আছে...তাই বলো !

শিবশঙ্কর কহিলেন—তা ঠিক নয়। মানে, একটু কথাবার্ত্তা কয়ে মনটাকে চাঙ্গা করে নেওয়া...

পুষ্পিতা কহিল—কিন্তু এ বৃষ্টিতে যাবে কি করে ? স্কুলের কম্পাউণ্ডে দেখেচো, কি রকম জল জমেছে !...পথে পথ নেই...শেষে কি একটা accident করে বসবে!

হাসিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—বলিস কি ! এমন অসমর্থ আমি হয়েছি যে পথ চলতে পড়ে যাবো ? বর্ষাতি-কোটটায় গা ঢেকে ছাতা মাথায় দিয়ে একটু ঘুরে আসি। তোর দুশ্চিন্তা হয় যদি তো কালো না হয় সঙ্গে চলুক···ফিরে এসে তোকে আমার নির্ব্বিঘ্নে পৌছনোর খপর দেবে···

বাপের অস্থিরতা বুঝিয়া পুষ্পিতা কহিল—যাও। কিন্তু বেশী রাত করো না...

—না।

ছাতা মাথায় দিয়া দেহকে যথাসম্ভব সংরক্ষিত করিয়া শিবশঙ্কর সেই জলে বাহির হইয়া গেলেন।

পুষ্পিতার সেলাই শেষ হইল। সেলাই রাখিয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল বাহিরের বারান্দায়।...বাহিরে পৃথিবী সত্যই যেন ভাসিয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে...মানুষের সঙ্গে মানুষের সব সম্পর্ক যেন মুছিয়া গিয়াছে! ...ওদিকটায় কি জমাট অন্ধকার!

জীবনের কথা পুষ্পিতার মনে পড়িল। আলো-ভরা নিজের অতীত জীবন...সেও এই জলস্রোতে কতদূরে ভাসিয়া গেছে···এখন শুধুই অন্ধকার! গাঢ় অন্ধকারে দিনের পর দিন কাটিতেছে একই ভাবে। কোথাও তার বৈচিত্র্য নাই—নূতন সম্ভাবনাও কোনো দিকে নাই! এর পর—তারপর...কিছু নাই! সব ঐ অন্ধকারে মিশিয়া একাকার···

পুষ্পিতা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল···তারপর ঘরে আসিল। রান্না করিতে হইবে। কালো উহুনে আগুন দিয়া গিয়াছে।

উহুন জ্বলিয়াছে। পুষ্পিতা রান্নায় বসিল।

মনে হইল, দুদিন আগে রান্নার কিছু জানিত না। কোনো দিন নিজের হাতে রাঁধিবে, এ কল্পনা মনে জাগে নাই। রান্নার কাজ···সে ভাবিত, তার সাজে না! কিন্তু এখন?

এ কাজে কিসের লজ্জা! কিসের কষ্ট! ছুঁচ-সুতা লইয়া রকমারি সেলাইয়ের কাজ যেমন, রান্নাও তেমনি! স্বরলিপি মিলাইয়া গানের সুর শেখা—রান্না তার চেয়ে কেন হীন হইবে? আগুন তাত? কষ্ট কোন্

কাজে নাই ? রকমারি বিলাতী ডিশ রাঁধিলে যদি মান বাড়ে, তবে ডাল-তরকারী রাঁধিলেই বা মান যাইবে কেন ?

ভাবিল, সংসারে বাস করিয়া সংসারের অর্দ্ধেক কাজের উপর অবজ্ঞা পুষিয়া কি-বা লাভ হইতেছিল ! পয়সা-কড়ির সঙ্গে বিলাসকেই বড় করিয়া দেখিত ! ভগবান তাই পয়সাকড়ি কাড়িয়া আজ শিখাইয়া দিলেন, মানুষের আসল দাম বিলাসে নয় ! আসল দাম...

বাহিরে সহসা পরিচিত কণ্ঠে সদানন্দ বাবুর স্বর শুনিল—শিববাবু আছেন ?

পুষ্পিতা বাহিরে আসিল। বলিল—না। এইমাত্র তিনি আপনার ওখানে গেছেন। কালো সঙ্গে গেছে। বসে বসে ভালো লাগছিল না, তাই বললেন, ঘুরে আসি।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আমার ওখানে ? হবে। আমি ক'দিন ধরে বসে বসে আর থাকতে পারলুম না...পাল্কী নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ঘোরা পথে আমার পাল্কী এসেছে—শিববাবু বোধ হয় গলি পথ দিয়ে গেছেন, তাই দেখা হয়নি ! তাছাড়া দেখবো কি ! আমার পাল্কী বন্ধ —পথে কে যাচ্ছে, না যাচ্ছে, তা দেখবার উপায়ও ছিল না তো !

পুষ্পিতা কহিল—বসবেন ?

সদানন্দ বাবু একবার দ্বিধা করিলেন, পরে বলিলেন—এলুম একটু ...বসি ! তা ভালো কথা, শিববাবু আমার ওখানে বসে থাকবেন হয়তো আমার পথ চেয়ে ! তার চেয়ে আমার পাল্কী আছে। বেয়ারারা পাল্কী নিয়ে যাক—পাল্কীতে করে তাঁকে নিয়ে আসুক...আমি বসছি।

বেয়ারাদের যথারীতি আদেশ দিয়া সদানন্দ বাবু আসিয়া ঘরে বসিলেন।

পুষ্পিতা কহিল—চা খাবেন ?

সদানন্দ বাবু বলিলেন—চা!···একটু পরেই না হয় চা তৈরী করবেন। আপনার বাবা আসুন—এই জলে এতখানি পথ ভিজচেন তো···

পুষ্পিতা কহিল—আচ্ছা।...তাহলে আমি আসি···রান্না চাপিয়েছি...

রান্না! বিস্ময়ে সদানন্দ বাবুর দুচোখ কপালে উঠিল! তিনি বলিলেন, —আপনি নিজের হাতে রান্না করেন?

হাসিয়া পুষ্পিতা কহিল—নাহলে কে রেঁধে দেবে, বলুন...

তা বটে! অবস্থা খারাপ! না হইলে এমন মেয়ে স্কুলে মেয়ে পড়াইতে আসিবে কেন? তিনি বলিলেন—আমি জানতুম, কালো রাঁধে।

পুষ্পিতা কহিল—কালোদাই রাঁধতো। আমি বলেছি, তা হবে না কালোদা, আমি রাঁধবো। দুজনে তর্ক হতো। এখন সন্ধি হয়েছে। তার ফলে সকালে রাঁধে কালোদা, এবেলায় আমি রাঁধি।

সদানন্দ বাবু কোনো কথা বলিলেন না। বুকের মধ্যে যেন তীর বিঁধিল! পুষ্পিতা গেল রান্নাঘরে। সদানন্দ বাবু ভাবিতে লাগিলেন···

জীবনটা কি করিয়াই যে কাটিল! স্ত্রী...ভালোবাসা! কখনো মিলিয়াছে? স্ত্রী ছিলেন...স্ত্রীর সাধ মিটিয়াছে! কিন্তু ভালোবাসা? যে-ভালোবাসায় জীবনে রোমাঞ্চ জাগে...যে-ভালোবাসায় সংসারের আর সব বস্তু, সব চিন্তা তুচ্ছ মনে হয়! অথচ...

প্রথম-যৌবনের কথা মনে পড়িল। সে যেন সেদিনকার কথা! কলেজে কাব্য-নাটক পড়িতেন, সাহিত্যের কুঞ্জবনেও বিচরণ করিয়াছিলেন—ওফেলিয়া, ডেশডেমোনা, শকুন্তলার কথা জানেন। শেলি পড়িয়াছেন, কীট্‌স্ বায়রণ পড়িয়াছিলেন! মনে পড়িল কয়েকটি পড়া কবিতার কয়েকটি ছত্র...

She walks in beauty like the Night…The fountains mingle with the river…এমন দিনে তারে বলা যায়…

তার পর বিবাহ হইল…স্ত্রী আসিলেন পাশে…কিশোরী রূপসী! দুদিন মনে জাগিল বিহ্বলতা! তারপর কোথায় রহিল প্রেম…স্বপ্ন-মাধুরী…কুহক-মায়া! ধূলা-কাদা মাখিয়া জীবনটা কি এক পথে চলিল…হুঁশ ছিল না, কোন্ মরুপথ দিয়া চলিয়াছেন কিসের লোভে!

আজ হুঁশ হইয়াছে…কিন্তু জীবনের বসন্ত চলিয়া গিয়াছে…

কেমন স্ত্রী চাহিয়াছিলেন? মনের কুঞ্জে প্রতিমার বেশে কে আসিয়া দেখা দিত? এই পুষ্পিতা। তার কথায়, তার ভঙ্গীতে অনন্তযৌবন, অফুরন্ত মাধুরী! তাকে ঘিরিয়া যে-রহস্য বিরাজ করিত, সে রহস্য নিত্য-জীবনের কাজ-কর্ম্মে মলিন হইবার নয়…ঘুচিবার নয়…ভাঙ্গিবার নয়!

পুষ্পিতা! গান গায়…পুষ্পিতা গল্প করে, দুনিয়ার খপর জানে…পুষ্পিতা রান্নাও করে। তবু যেন বিদ্যুৎবহ্নি…তাকে দেখিতে ভালো লাগে—কিন্তু ধরা যায় না!…

অসংলগ্ন এমনি নানা চিন্তা ধারায় ধারায় মনে বহিয়া চলিয়াছে, বাহিরের ঐ বৃষ্টি-ধারার মতোই অবিরাম! এবং এমনি চিন্তার মাঝখানে সহসা পুষ্পিতা আসিয়া দেখা দিল। তার অঙ্গে দিব্য বেশ ভূষা…লাবণ্যশ্রী সারা অবয়বে ঝলমল করিতেছে!

সদানন্দ বাবুর চমক ভাঙ্গিল। সদানন্দ বাবু কহিলেন,—রান্না হয়ে গেল?

পুষ্পিতা কহিল—আপাততঃ চুকলো। যা বাকী, তা বাবা এলে হবে।…গা ধুয়ে এলুম বলে দেরী হলো। আপনি একা বসে আছেন…

সদানন্দ বাবু বলিলেন—কোনো অসুবিধা হলো না তো?

—না, না·· অসুবিধা কিসের! অসুবিধা আপনার হবে...বাবা নেই ···কার সঙ্গে কথা কইবেন!

সদানন্দ বাবুর বুকখানা তোলপাড় করিয়া উঠিল! মনে হইল, শুষ্ক তরুতে মঞ্জরী-বিকাশের কল্পনা···সে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন। তবু তিনি বলিলেন—কেন তোমার সঙ্গে কথা কওয়া যায় না?

পুষ্পিতা কহিল—আমি তো ভারী মানুষ...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়। প্রতিপদে নিজেদের অপদার্থতা বুঝতে পারি।

—অপদার্থতা! পুষ্পিতা যেন শিহরিয়া উঠিল।

—তা বৈ কি! আমরা সেকেলে, কি-বা পড়েছি! কি-বা শিখেছি! কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক সেরে বিষয়কর্ম্ম নিয়ে মেতে আছি। কালে-কালে পৃথিবী বদলে চলেছে,···কোথায় কি হলো, তার খপর পর্য্যন্ত রাখিনি! রাখবার মতো মনের শিক্ষাই আমাদের হয়নি। তাই তোমাদের এখানে এসে যেদিন তোমার কথায় যোগ দিতে পারি, সে দিন কত কি জেনে বাড়ী ফিরি...মনে হয়, দিনটা সার্থক হলো!

এ-সব কথা মুখে আসিল কোথা হইতে, নিজের কানে নিজের কথা শুনিয়া সদানন্দ বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সলজ্জ মৃদু হাসে পুষ্পিতা কহিল—কি যে বলেন আপনি। আমার ভারী লজ্জা করছে আপনার কথা শুনে।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—সেদিন তুমি বলছিলে, মেয়েদের শিক্ষার কথা, আমরা মেয়েদের স্কুল খুলেছি, অথচ ও সব কথা আমাদের মনে জানি!...তা তুমি বসো···

পুষ্পিতা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, সদানন্দ বাবুর কথায় কাছের চেয়ারে বসিল।

সদানন্দ বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—তোমাকে দেখে আমার কেবলি মনে হয়...

সাগ্রহ দৃষ্টিতে পুষ্পিতা চাহিল সদানন্দ বাবুর পানে···সদানন্দ বাবু তাহার পানে চাহিয়াছিলেন···দুজনে চোখোচোখি হইল। পুষ্পিতা সে দৃষ্টির স্পর্শে মাথা নামাইল।

সদানন্দ বাবু কহিলেন—তুমি যদি কিছু মনে না করো, তা হলে বলি...

মাথা না তুলিয়াই পুষ্পিতা কহিল—বলুন...

সদানন্দ বাবু কহিলেন—আমাদের দেশে মেয়েদের বিবাহ না করা...আমার কেমন ভালো লাগে না!...

পুষ্পিতার মাথা আরও নামিল।

সদানন্দ বাবু কহিলেন—শিববাবুকে সে দিন এ-কথা বলছিলুম··· তিনি বললেন, বিয়ে দিতে চান—তবে তোমার যোগ্য পাত্র কোথায় পাবেন, এই তাঁর চিন্তা! কথাটা বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয়···

সদানন্দ বাবু চুপ করিলেন...গলার কাছটায় কি একরাশ জমিয়া গলা যেন চাপিয়া ধরিল! কিন্তু এতখানি বলিবার পর চুপ করিয়া থাকা চলে না! তাই কাশিয়া গলা সাফ করিয়া লইয়া আবার [illegible] এমন পাত্র যদি উপযাচক হয়ে আসে যে তোমার মান-মর্যাদা বুঝবে... যে তোমাকে শিরোধার্য্য করে গৌরব বোধ করবে...অর্থাৎ এমন লোক আছে...তবে একটু বয়স হয়েছে...তা বয়সটাই তো সব নয়!...যে-লোকের কথা বলছি, বয়স হলেও এ-লোকের মনের যৌবন এখনো শুকিয়ে যায় নি...। আজ সারা দিন এই কথাটাই মনে হয়েছে! তাই ভাবলুম, শিববাবুকে যখন এমন আপনার জন বলে গ্রহণ করেছি, তখন তাঁর এ দুশ্চিন্তা যদি দূর করতে পারি...

লজ্জায় পুষ্পিতার চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। এ ঘর হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে কেমন চলিয়া যাইতে পারিল না। কে যেন পেরেক দিয়া তাকে এই চেয়ারখানায় আঁটিয়া রাখিয়াছে!

নিরুপায়ে সে ঘামিতে লাগিল...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—এ লোকটির বিবাহ হয়েছিল—কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এক-সংসারে বাস করলেও শুধু সংসার-যাত্রাই নির্ব্বাহ করেছে ...মানে, যাকে জীবন বলে, সে জীবনের স্বাদ কখনো পায় নি! তা ভয় নেই...সে স্ত্রী বেঁচে নেই···কিন্তু তাঁর সাধ, বাঁচবার মতো বাঁচতে চান!···

এ-কথার পর নিজেকে সবলে চেয়ারের বাঁধন হইতে মুক্ত করিয়া দ্রুত পায়ে পুষ্পিতা সেখান হইতে চলিয়া গেল···

সদানন্দ বাবু যেন কাঠ!

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে আলোর আভাস এবং কালোর কণ্ঠস্বর—পালকী নামা একেবারে বারান্দা ঘেঁষে...

নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বাবু উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিলেন, এবং বাহিরে পাল্কী হইতে নামিলেন শিবশঙ্কর বাবু!

শিবশঙ্কর বাবু কহিলেন—ভারী মজা তো! আমি গেছি ওদিকে আপনার বাড়ী, আর আপনি এসে বসে আছেন আমার বাড়ী...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—মনে-মনে জোর বাঁধন পড়েছে কি না! দেখাশুনা না হলে মন উতলা হয়।

শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন—তাই দেখছি...আসুন, বসা যাক্।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—কিন্তু নটা বাজে! আপনার খাবার সময় হলো।

শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন,—এ জন্মে দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে,

আর খাবার নিয়ম-কানুন উল্টোবে না? না, না, আসুন, দু'বাজি খেলা হোক!

সদানন্দ বাবুর বুকের মধ্যে কাঁপন জাগিল...পুষ্পিতাকে একা পাইয়া একটু আগে যে সব কথা বলিয়া বসিয়াছেন...খুব স্পষ্ট কথা না বলিলেও আভাসে সে কথার অর্থ পুষ্পিতা বোঝে নাই কি? বুঝিয়াছে নিশ্চয়! নহিলে অমন নিঃশব্দে পুষ্পিতা চলিয়া যাইবে কেন? তাই সে কথা স্মরণ করিয়া এখন শিবশঙ্করের সামনে মনে কেমন অস্বস্তি জাগিল।

শিবশঙ্কর ছাড়িবার পাত্র নন্...মনের বাসনাকে কখনো দাবিয়া রাখিতে পারেন নাই। কাজেই খেলার ছক পড়িল এবং গজ-মন্ত্রীর চালের মধ্যে অচিরে জগৎ-সংসার বিলুপ্ত হইয়া গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কালো আসিয়া বলিল—আপনাদের দুজনের খাবার দিয়েছে দিদি...

দুজনেই সচেতন হইলেন। কহিলেন—খাবার...?

কালো বলিল,—হ্যাঁ। দিদির শুধু লুচি ভাজতে বাকী...আসন পাতা হয়েছে। রাত অনেক হয়েছে! দশটা বেজেছে।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—কিন্তু আমার জন্য আবার এ হাঙ্গামা কেন?

শিবশঙ্কর কহিলেন—ভালোই তো...খেলা হলো...কথাবার্ত্তা হয়নি। খেতে-খেতে কথাবার্ত্তা হবে'খন!

এই কথা বলিয়া উচ্চরবে তিনি খুব খানিকটা হাসিলেন।

কালো বলিল—তাহলে দিদিকে বলি লুচি ভাজতে। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসনে এসে বসুন...দেরী করবেন না।

শিবশঙ্কর বলিলেন—না।

১২

সেদিন বাড়ী গিয়া বিজু কাহারো সঙ্গে কথা কহিল না, স্নান ও আহার করিল না, গুম্ হইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। ঘণ্টাখানেক পরে মা আসিয়া বলিল,—শুয়ে আছিস যে! খাবি না?

বিজু কহিল—না।

মা বলিল—কোথাও খেয়ে এসেছিস বুঝি?

বিজু বলিল—না।

মা বলিল—তবে শুলি যে!

বিজু বলিল—মাথা ধরেছে। আমাকে বিরক্ত করো না…

মা বলিল—বিরক্ত করিনি বাছা। উমাপদ এসেছিল,…বলে গেছে, ওরা বাইরে কোথায় যাবে নাচ-গানের দল তৈরী করে…তাই এসেছিল তোমার সঙ্গে কি পরামর্শ করতে।

এ কথায় বিজু উঠিয়া বসিল, কহিল—আবার কখন আসবে, বলে গেছে?

মা বলিল—একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে…দিচ্ছি এনে…

মা চলিয়া গেল। বিজু বসিয়া রহিল। অজানা ভয়ে মনে-মনে বলিল, তাই করিব। ইহাদের সঙ্গে এক স্রোতে গা ঢালিয়া দিব! পুরুষ-মানুষকে করিব আমার বলি—আমার পণ! এত-বড় অপমান করে অক্ষয়! অথচ আমি…

কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশ! এ আক্রোশে অক্ষয়ের কোনো ক্ষতি হইবে না। সমাজের বুকে দর্পভরে সে মাথা তুলিয়া বেড়াইবে…বিজুই নৈরাশ্যে জ্বলিয়া খাক্ হইতে থাকিবে।

য়া চিঠি আনিয়া দিল। বিজু খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। পড়িল,—

উমাপদ লিখিয়াছে—

বিজু

একটা ভ্যারাইটি-শো লইয়া টুরে যাইতেছি। পাঁচশো টাকা ক্যাপিটাল জোগাড় হইয়াছে। ছোট ছোট দুটি ড্রয়িং রুম্‌প্লে এবং ভদ্র তরুণ-তরুণীদের নাচ-গান বাজনা। বিলাসকে পাইয়াছি। সে স্বরোদ বাজাইবে; ভূষণ বাজাইবে বাঁশী। যমুনা, আভা, গায়ত্রী, মায়া সেন—এরা সঙ্গে যাইবে। তুমি যদি যাইতে পারো—তাই আসিয়াছিলাম। এ্যামেচারী নয়—পয়সা পাইবে। ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া সকলেই কিছু উপার্জ্জন করিতে চাই। যদি সাক্‌সেশ্‌ হয়, ভবিষ্যৎ ভালো। পারি, ওবেলায় আসিব। সারা দুপুর বেলা রিহার্শালের ব্যবস্থা করিয়াছি কোমেদান বাগানে হরকান্ত সাহার বাড়ীতে। মতামত শীঘ্র জানিতে চাই।

উমাপদ সেন।

বিজুর মন নাচিয়া উঠিল। ওবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা সম্ভব নয়! তার চেয়ে যাওয়া যাক এখনি কোমেদান-বাগানে। হরকান্ত সাহার বাড়ী সে জানে...তার প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া অনেকবার এই হরকান্ত বিজুর আশে-পাশে ঘুরিয়াছে! বিজু তখন আপন-মনে বিভোর ছিল, তাই আমোল দেয় নাই। এখন···

মনের আক্রোশ তখনো এ-সম্ভাবনায় মিলায় নাই। মনে-মনে সে বলিল, বেশ, এই হরকান্ত সাহাকে সে করিবে তার হিংসা-যজ্ঞে প্রথম বলি!

উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বিজু আপনাকে সজ্জা-ভূষায় বিভূষিত করিল, তার পর বাপের ড্রয়ার খুলিয়া গোটা পাঁচেক টাকা লইয়া ভ্যানিটি-ব্যাগে ভরিল।

এবং পথে আসিয়া একখানা ফিটন ভাড়া করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল,—কোমেদান-বাগান চলো।

জমাট আসর। গায়ত্রী গোস্বামী নাচিতেছে—প্রজাপতি-নৃত্য,—তাকে গাইড করিতেছে একটা সিড়িঙ্গে ছোকরা।

আভাকে বিজু প্রশ্ন করিল—এ লোকটি?

আভা বলিল,—জানো না? বিমলা সেন…এতদিন ছিল বোম্বাইয়ে। সেখানে ওরিয়েণ্টাল প্রোডিউসার্সে ড্যান্সিং-মাষ্টার ছিল।

—ওঃ! বলিয়া বিজু এক ধারে চুপ করিয়া বসিল।

উমাপদ আসিয়া বলিল,—ভালো করেছো—এসেছো। আমাদের সময় নিয়ে ভাঁরী গোলমাল চলছে। ক'দিনের মধ্যে উদ্যোগ-আয়োজন করতে হচ্ছে। ড্রেস, মেক-আপ, ঝুটো গহনাপত্র,—তারপর বাজিয়ে ঠিক করা…হিম্‌সিম্ খাচ্ছি। এমন লোক নেই যার উপরে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। হ্যাঁ, এর উপরে আছে রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে ভাড়ার কনসেশন্ ব্যবস্থা!…

বিজু বলিল—কোথায় যাবে?

উমাপদ বলিল—প্রথমে যাবো বর্দ্ধমান। তারপর আসানসোল,—সেখান থেকে ধানবাদ, হাজারিবাগ, রাঁচি। রাঁচি থেকে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর…মানে, সেগুলো নির্ভর করবে সাক্‌সেসের উপর। আপাততঃ রাঁচি পর্য্যন্ত আয়োজন পাকা। ষ্টেজ জোগাড় হয়ে গেছে।

বিজু বলিল,—আগে আমাকে বলোনি কেন?

উমাপদ বলিল—তোমার অক্ষয় দেবতা পাছে নিষেধ তোলেন…

বিজুর মনের মধ্যকার আগুনটুকু নিব-নিব হইতেছিল, উমাপদর এ-কথায় সে আগুন যেন ধোঁয়াইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল।

বিজু বলিল—আজ হঠাৎ তবে খবর দিলে যে?

উমাপদ বলিল—একটা চান্স! অক্ষয়রাজকে বলে কয়ে যদি মত করাতে পারো? তা কি হবে? সে ছেড়ে দেবে তো?

বিজু ফোঁশ করিয়া উঠিল, কহিল—সে কে...শুনি? আমাকে কিনে রেখেছে না কি যে, তার আজ্ঞা নিয়ে আমাকে চলতে ফিরতে হবে? আমার যেতে ইচ্ছে হয়—একটা অক্ষয় কি, এক-হাজার অক্ষয়ের বারণ আমি শুনবো না।

উমাপদ বলিল—এই তো আর্টিষ্টের কথা! আগে আর্ট, তারপর আর সব!...তাহলে ভালো। তোমার নামটা বিজ্ঞাপনে ঢুকিয়ে দিতে পারি? বিখ্যাত রেডিয়ো-গায়িকা, গ্রামোফোন-কুঞ্জের কোকিল শ্রীমতী বিজয়া দেবী...

বিজু বলিল,—টাকাকড়ির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থার কথা যে বলেছিলে...

উমাপদ বলিল—আপাততঃ বেরুবার সময় পকেট-মনি সকলকে দিচ্ছি ফিফ্‌টীন। তার পর বিক্রীব উপর বখরা।...সবাই সমান শেয়ার পাবে...কোনো তফাৎ থাকবে না। মিলে মিশে কাজ করছি। ছোট-বড় ভেদ আমরা রাখবো না... তাতে হার্টবার্ণিং হবে জানি তো...তুমি এসো...সাহা খুব খুশী হবে তুমি এ পার্টিতে জয়েন করেছো শুনলে...

বিজু বলিল—কোথায় তোমার হরকান্ত সাহা?

স্বর মৃদু করিয়া উমাপদ বলিল—জানো তো, তার ঐ একটা উইক্‌নেশ্‌...একটু ড্রিঙ্ক করা। পাশের ঘরে সে আছে। একটু ড্রিঙ্ক করেছে বলে' তাকে আর ঘরে আনিনি...হাজার হোক, ভদ্র মহিলাদের আসর তো...

বিজুকে লইয়া উমাপদ আসিল পাশের ঘরে।

হরকান্ত বসিয়া আছে সোফায়—সামনে টিপয়। টিপয়ের উপর বোতল এবং গ্লাস।

মূর্ত্তি দেখিয়া বিজুর সারা দেহ রী রী করিয়া উঠিল। মনকে সে উপদেশ দিল…না, খবর্দ্দার।

উমাপদ বলিল—Acquisition, মিষ্টার রায়।

মুদিতপ্রায় চোখ মেলিয়া হরকান্ত চাহিল। দু'চোখ রাঙা।

হরকান্ত বলিল—ইনি কোন্ লেডি?

উমাপদ বলিল—শ্রীমতী বিজয়া দেবী।

হরকান্ত বলিল—অক্ষয়রাজ অনুমতি দেছেন তাহলে?

উমাপদ বলিল—অক্ষয়-রাজের স্ত্রী নয়, বোন নয়, সে অনুমতি দেবার কে? একজন ফ্রেণ্ড!

হরকান্ত বলিল—Bosom friend কি না…আমাদের সঙ্গে তিনি কথাই কন্ না! অক্ষয়রাজ অনেক টাকার মানুষ, জানি…কিন্তু আমরাও নেহাৎ কৌপীনানন্দ স্বামী নই! মোটর গাড়ীও এক আধখানা আছে!

বিজুর কদর্য্য লাগিল। এমন সংসর্গে সে মেশে নাই, বা আসে নাই, তা নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে এমন সব কথাবার্ত্তা…

উমাপদ বলিল—আমরা তাহলে ওঘরে যাই। বিজুর সঙ্গে পরামর্শ করে' ওর প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলি…

হরকান্ত বলিল,—আমার এ ঘরে বসেই সে কাজটা করো না মাষ্টার! ওঁর সঙ্গে না হয় সেই ফাঁকে একটু আলাপ করি।…যখন আমাদের দলভুক্ত হলেন…luck…ওঁর নাম করে এক পাত্র…কি বলেন বিজয়া দেবী?

বিজয়া কোন জবাব দিল না! এই জানোয়ারটার উপর দিয়া সে তার যজ্ঞের উদ্বোধন করিবে ভাবিয়াছিল—কিন্তু…

উমাপদ বলিল,—বসো বিজু...তুমি কি কি গান গাইবে, একটা ফিরিস্তি দিতে পারো?

বিজু বলিল—কবে তোমরা বেরুচ্ছ?

উমাপদ বলিল—সামনের সোমবার। মঙ্গলবার থেকে সেখানে পার্ফর্ম্যান্স সুরু...পাব্লিশিটির দল চলে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে প্রোগ্রাম ছাপার অর্ডার দেবো।

বিজু বলিল—একটু ভেবে দেখি...

হরকান্ত বলিল—একখানা গেয়েই না হয় ভাববেন! সত্যি, আপনার গান আমার ভারী ভালো লাগে। এক এক সময় মনে হয়, আপনাকে মাষ্টার রেখে আপনার কাছে গান শিখি। কিন্তু সে পথে অক্ষয়-রাজ তলোয়ার খুলে পাহারা দিচ্ছে।

বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে বিজু চাহিল উমাপদর পানে, কহিল—ইনিও সঙ্গে যাবেন তো?

উমাপদ কহিল—নিশ্চয়। উনি ক্যাপিটালিষ্ট...তবে কি জানো, উনি একপয়সা লাভ চান না, সুদ নেবেন না···সাক্‌সেস্ হয়, ওঁর টাকা শুধে দেবো···সাক্‌সেশ্ না হয়, উনি বললেন, এক পয়সা দাবী করবেন না! এরকম টার্মসে কে আজকাল আর্টের অতো সমঝদারি করে, বলো!

বিজু বলিল—কিন্তু বিদেশে গিয়ে উনি যদি এ ভাবে থাকেন, তা হলে তোমার কোম্পানীর দুর্নাম হতে পারে।

উমাপদ বলিল—ওকে সাবধানে রাখতে হবে···নিশ্চয়। এ জ্ঞানটুকু আমার আছে।

বিজু বলিল—মনে রেখো এ কথা।

উমাপদ বলিল—ওর আবার নেশার পিরিয়ড আছে...খেলে না তো খেলে না। কিন্তু একবার খেতে সুরু করলে পাঁচ ছ'দিন সমানে খাওয়া

চলে...তারপর আর-খাবার সামর্থ্য থাকে না। এবং তুহস্তা আর ড্রিঙ্ক ছোঁয় না।

বিজু বলিল—ভালো। ...আমি কিন্তু সব টলারেট করতে পারি পারিনা শুধু ড্রিঙ্ক আর ড্রাঙ্কার্ডকে টলারেট করতে।

হাসিয়া উমাপদ বলিল—ভয় নেই।

বর্দ্ধমানে যাইবার দুদিন আগে শনিবার সন্ধ্যায় রিহার্শাল হইতে ফিরিয়া বিজু এ-কথা মাকে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মা চমকিয়া উঠিল, বলিল—ওঁকে না বলে কোথায় চলেছিস, ডাগর সোমত্ত মেয়ে!

বিজু বলিল—ডাগর সোমত্ত মেয়ে যে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো তো বারণ করো নি!

মা বলিল—তা বলে বর্দ্ধমান! কতকগুলো ছেলে-ছোকরার সঙ্গে! লোকে শুনলে কি বলবে?

বিজু বলিল—লোকের কোন্ কথাটা তোমরা মেনে চলো?

মায়ের বিস্ময়ের ভাব তখনো কাটে নাই,—মা বলিল—বিয়ে হবে কেন এর পরে? উনি বলছিলেন একটি পাত্র পেয়েছেন—কাল সে আসবে দেখাশুনা করতে।

বিজু বলিল—কে তোমাদের পাত্র, শুনি!

মা বলিল—তা জানি না। উনি বলছিলেন, হাইকোর্টে কাজ করে—সরকারি চাকরি। পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়...বিয়ে করেছিল, সে বৌ মারা গেছে। আবার বিয়ে করবে। ডাগর মেয়ে চায়...মা নেই, বাপ নেই, কেউ নেই...মাইনে বাড়বে এর পর। দু বছরমাত্র চাকরিতে ঢুকেছে।

বিজু বলিল—পঞ্চাশ টাকার উপর নির্ভর করে আমি বাঁচতে পারবো না।

মা বলিল—তার মানে ?

বিজু বলিল,—আমার বয়স হয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কচি খুকিটির মতো যার হাতে ধরে দেবে, তাকেই মেনে নিতে হবে—আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় !

চোখ বিস্ফারিত করিয়া মা বলিল—এ তুই কি বলছিস বিজু ! তোর বয়সে আমারো তো বিয়ে হয়েছিল।

বিজু বলিল—বিশ বছর আগে যে ব্যবস্থা ছিল, বিশ বছর পরেও সে ব্যবস্থা চলবে, তুমি ভাবো ?

মা বলিল—অক্ষয়ের পিছনে ঘুরে বেড়ালি...শুনলুম' সে বিয়ে করবে। তা সেও সেদিন ওঁকে জবাব দেছে,—না। বিয়ে করবে বলেছিল বটে, কিন্তু পাঁচজনে এ বিয়েতে সায় দিচ্ছে না। তাই সে ক্ষমা চেয়েছে···

বিজু কহিল—বাবা তার পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিল বুঝি ?

মা বলিল—তা কেন ? এ-পাত্রটির কথা উনি এসে আমাকে বলেন। আমি অক্ষয়ের কথা বলি। শুনে উনি বললেন—তা কি সম্ভব ? সে হিঁদুঘরের ছেলে—পয়সা আছে...বিয়ে করতে সে রাজী হলেও তার আত্মীয়েরা এ বিয়ে হতে দেবে কেন ? তবু আমি বললুম, না গো, সে ছেলে উপযাচক হয়ে বিয়ে করতে চায়...তাতে আমাকে বকলেন কত... বললেন, তার সঙ্গে মেয়ে ঘুরে বেড়ায়—কিছু শাসন নাই তোমার !

এ কথায় বিজু জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—বাবা তাকে ত্যাখেনি এখানে ? তখন তো বারণ করতে পারেনি ! মেয়ের কাপড়-চোপড়, হাত-খরচাটা বাবার পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না—তাঁর রেশের বেটিং এর জন্যে ভাবতে হয় নি তাই বুঝি এ খেয়াল হয়নি !

মা রাগ করিয়া তীব্র কণ্ঠে ডাকিল—বিজু...

বিজু বলিল—এখন ধমকালে কি হবে? তোমাদের জন্ত আমার জীবনটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তার উপরে আমার মায়া মমতা আর এক তিল নেই! মরবো না...বাঁচতে চাই—কিন্তু এ বাঁচা মানুষের মতো বাঁচছি, কি, জানোয়ারের মতো বাঁচছি সেদিকে দেখবার রুচি বা প্রবৃত্তি আমার নেই। শোনো মা,...যে পাত্র বাবা কাল নিমন্ত্রণ করে আনবে, পারো তোমাদের মেজো মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ো। আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না...হতে পারে না।...আমি যা উচিত মনে করবো, তাই করবো...তাতে তোমরা বাধা দাও, সে বাধা মানবো না। যদি বাড়ীতে থাকতে না দাও, দিয়ো না—আমার আশ্রয় আমি নিজে গড়ে নিতে পারবো...

মায়ের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মা এতদিন এত কথা ভাবিয়া বুঝিয়া দেখে নাই তবু মা ত!

বিজুর হাত ধরিয়া মা বলিল—হয়তো তোর কথা সত্যি। তোর কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে বিজু—এই ছাখ্...শোন্, হয়তো আমাদের অবহেলায় তোর প্রাণ আজ খাক্ হয়ে গেছে! তোর পানে যে উচিতমতো নজর রাখতে পারিনি, তার কারণ, পয়সা-কড়ির দুশ্চিন্তা।...তা বলে এ সব মনে নিস্‌নে...বর্দ্ধমানে যেতে হয়, যা... কিন্তু ফিরে এসে বিয়ে কর্... পাত্র ভদ্র—সরকারী কাজ করে...পঞ্চাশ টাকা মাইনে হলেও এ-মাইনে বাড়বে। পাত্রের বয়স অল্প...ভবিষ্যতে উন্নতির অনেক আশা আছে...শোন্ মা...

বিজু বলিল—না। এ বিয়ে হতে পারে না। আমার যে-মন একদিন সংসারের স্বপ্ন দেখতো, সে-মন ভেঙ্গে চুর হয়ে গেছে...তোমরাই আমার সে মনকে ভেঙ্গে পিষে চুরমার করে দেছ। মেয়ে বলে কোনোদিন মুখের পানে তাকাওনি...। সেই শুভেন্দু...যদি গোড়ায় বাধা দিতে ... হয়তো আমার মন আজ এমন হতো না।

বিজু নিশ্বাস ফেলিল...তারপর বলিল,—বাবাকে বলো, বিয়ের সম্বন্ধে আমার মনকে আমি তৈরী করতে পারিনি। কম বয়সে যদি বিয়ে দিতে, হয়তো কোনো কথা বলতে পারতুম না! এখন···? বিয়ে করতে বললে ভেবে দেখতে হবে, বিয়ে করবো কি না...বুঝলে!

এই কথা বলিয়া বিজু চলিল গা ধুইতে...

মা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল...

গা ধুইয়া বিজু ফিরিল, মা তেমনি দাঁড়াইয়া আছে বিমূঢ়ের মতো।

বিজু কহিল—কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছো যে!

নিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিল—তোমার কথায় কাঠ হবো, এ আর আশ্চর্য্য কি!

বিজু হাসিল। হাসিয়া বলিল—আমিও [illegible] কাঠ হয়ে গেছি মা। তোমাদের মুখের পানে তাইতো চাই[illegible] পারছি না!...যাক, তুমি কাজ করোগে আমি একবার সিনে[illegible] যাবো···হরকান্ত বাবু গাড়ী নিয়ে আসবে।

মেয়ের কথায় মায়ের চেতনা হইল। মা ক[illegible],—হরকান্ত বাবু আবার কে?

বিজু বলিল—বন্ধু। ইনিই ক্যাপিট্যালিষ্ট হ[illegible] আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন বর্দ্ধমানে।...লোকটি ড্রিঙ্ক করতো··· [illegible]র কথায় ড্রিঙ্ক ছেড়েছে। আমি সাফ বলে দিছি, নেশা-ভাঙ [illegible] আমি ও দলে লাখ টাকা দিলেও যোগ দেবো না···নেশাতে আমার যেমন ভয় তেমনি ঘৃণা! আমার সে কথা ভদ্রলোক মেনেছেন!...

মায়ের তবু তেমনি ভাব! বাকশক্তি যেন লোপ পাইয়াছে।

বিজু বলিল,—ভয় নেই মা। এ বয়সে পৃথিবীর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে নিজেকে তুচ্ছ ভেবে লুটিয়ে দেবো না···কোন দিন না...মৃত্যু হলেও না···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

৯৩

মনের সঙ্গে এ সংগ্রামে সদানন্দ-বাবু নিজেকে খাড়া রাখিতে পারিলেন না, একদিন শিবশঙ্করের কাছে কথাটা পাড়িয়া বসিলেন, একটু ঘুরাইয়া।

বলিলেন—যাই বলুন শিব বাবু, আপনার মেয়ের এই স্কুল-মাষ্টারি করা আমার ভারী বিশ্রী লাগে! এমন মেয়ে···তার বিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধে আপনাকে নিশ্চিন্ত দেখে আমার বিরক্তি হয়।

শিবশঙ্করের মুখ এ-কথায় কালো হইয়া গেল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—বিয়ে আমি দিতে চাই সদানন্দ বাবু... কিন্তু মস্ত বাধা আছে কি না...

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—টাকা-কড়ির জন্ম তো! কিন্তু আপনার মেয়েকে যদি এমন লোকে বিয়ে করতে চায়, যার টাকা-পয়সার অভাব নেই?···আপনার কাছ থেকে এক পয়সা পণ নেবে না... বরং আপনাকে মাথায় করে রাখবে—তাহলে?

পরম-উৎসাহে শিবশঙ্কর বলিলেন—আছে এমন পাত্র?

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আছে।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—কোথায়?

নিশ্বাস চাপিয়া সদানন্দ বাবু বলিলেন—দূরে নয়...

কুতূহলী দৃষ্টি সদানন্দ বাবুর মুখে নিবদ্ধ করিয়া শিবশঙ্কর বসিয়া রহিলেন।

সদানন্দ বাবু কি করিয়া কোথা হইতে কথা সুরু করিবেন...ভাবিতে লাগিলেন।

শিবশঙ্কর কহিলেন—বলুন...

সদানন্দ নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—তার আগে অনেক কথ বলবার আছে শিব বাবু...যদি ধৈর্য্য ধরে শোনেন।

শিবশঙ্কর বলিলেন—নিশ্চয় শুনবো।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—হয়তো আপনি চমকে উঠবেন...কিন্তু দয় করে সব কথা শুনতে হবে আপনাকে···

ভূমিকা দেখিয়া শিবশঙ্করের মনে দুশ্চিন্তা জাগিল। কিন্তু এই ভূমিকার অর্থ বুঝিলেন না; তাই একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন।

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—যদি আমার জীবনের কথা বলি, আপনি হয়তো একটু অবাক হবেন। কিন্তু সব কথা বুঝতে হলে আমার কথাটুকু ভালো করে বোঝা দরকার...মানে, একটু দরদ দিয়ে·· বুঝেছেন?

মাথা নাড়িয়া শিবশঙ্কর বলিলেন, বুঝিয়াছেন।

সদানন্দ বাবু তখন বলিলেন নিজের জীবনের কথা। তাঁর বয়স খুব বেশী নয়—পঞ্চাশ বৎসর কিন্তু নানা দুঃখে বয়সট দেখায় সত্যকার বয়সের চেয়ে···বেশী। ছেলেবেলায় তিনি কবিত লিখিতেন···রোমান্সের রঙে পৃথিবী দেখিতেন রঙীন্। মনে সাধ ছিল জীবনকে রোমান্সের রঙে রাঙাইয়া তুলিবেন। [illegible] টাকাকড়ির মধ্যে জীবনটাকে চুবাইয়া না ধরিয়া আকাশ-বা[illegible] বর্ণগন্ধের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেন। বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে শুধু সংসার-নৌকায় মাঝির মতো না দেখিয়া প্রেমিকের প্রেমময়ী প্রিয়তমা বলিয়া দেখিবেন! বিবাহ হইল...স্ত্রী কিন্তু রোমান্সের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। বড় লোকের মেয়ে—বাপের বাড়ী হইতে দু'চার খানা চিঠি-পত্র লিখিয়াছিলেন, সে চিঠি তেমন হয় নাই। তার পর স্ত্রী আসিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন।

সদানন্দ বাবুর বাপের ছিল চৈতাভোরের কারবার। বিবাহের পরে বাবা তাঁকে কারবারে ঢুকাইয়া দিলেন এবং প্রত্যহ ওজন করিয়া কাজের হিসাব লইতে লাগিলেন। কাজের চাপে মনের মধ্যে কবিতার কুঞ্জবন গেল চূর্ণ হইয়া...মনের রঙিন স্বপ্ন কোথায় মিলাইয়া গেল! তিনি সারাদিন কাজ-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন—সন্ধ্যার পর হিসাব নিকাশের পালা! সপ্তাহে ছটা দিন কলিকাতায় অফিসের দোতলায় ঘরে পড়িয়া রাত্রি যাপন করিতেন; শনিবার রাত্রে বাড়ী আসিতেন। অভ্যাস এমন হইয়া গেল যে সপ্তাহের ছটা দিন কাজের ভিড়ে ছুটা-ছুটি করিতে হইত, রবিবারে তাহারি হিসাব-নিকাশ চলিত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত কোথা দিয়া আসিয়া কখন চলিয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোনো খেয়াল থাকিত না! গ্রীষ্মের দিনে ঠাণ্ডা কাপড়-চোপড়, শীতের দিনে গরম কাপড়-চোপড় পরিতে হয়...ফাল্গুন আসিলে বসন্ত-রোগের টীকা দিতে হয়—ঋতুচক্র পরে-পরে ঘুরিয়া এই কথাটুকুই মনকে জানাইয়া গিয়াছে! স্ত্রী রহিলেন অন্দরে চাল ডাল নুন তেলের পাহারাদারী, পুত্র-কন্যা প্রসব এবং তাদের লালন-পালনের কাজ লইয়া...তাদের কি চাই না চাই, তাহার খবরদারী চলিত সদানন্দ বাবুর সঙ্গে। প্রিয়তমা প্রেয়সী হইবার জন্য কোনো দিন তিনি হৃদয়ের দ্বারে মালা-চন্দন লইয়া আসিয়া দাঁড়ান নাই। সদানন্দ বাবুর মনে কাজকর্ম্মের ভিড়ে ও কথাগুলা ঘেঁষ দিতে সাহস করে নাই! এমনি করিয়া বছরের পর বছর ঘুরিয়া চলিল এবং একদিন—সে আজ দু'বৎসরের কথা, গৃহিণী হঠাৎ সব ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। ছেলে-মেয়েরা কান্নার রোল তুলিল—সংসারের পাহারাদারীর কাজে ব্যাঘাত ঘটিল, এবং সবচেয়ে দুঃখ এই যে সদানন্দ বাবুর প্রাণের কোণ খালি হইয়া গিয়াছে বলিয়া একটি দিনের জন্য তিনি সে অভাব অনুভব

করেন নাই...কিন্তু বিপদ বাধিয়াছে শিবশঙ্কর বাবুর সংসর্গে আসিয়া···

এত কথা বলিবার পর সদানন্দ বাবু একবার শিবশঙ্করের পানে চাহিলেন।

শিবশঙ্কর একাগ্র মনোযোগে কাহিনী শুনিতেছিলেন। বাঙলা নাটক-উপন্যাস পড়া বহুদিন ছাড়িয়া দিয়াছেন—সদানন্দ বাবুর কাহিনী শুনিয়া মনে হইতেছিল, এ যেন ছাপার অক্ষরে নভেল পড়িয়া সদানন্দ বাবু তাহারি কথা বিবৃত করিতেছেন ··

সদানন্দ বাবু চুপ করিলে শিবশঙ্কর বলিলেন,—তার পর ?

সদানন্দ বাবু আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,— বছরখানেক হলো কারবার থেকে রিটায়ার করেছি। সেবারে অসুখ করে...বড় ছেলে জীবানন্দ বললে, আমি বড় হয়েছি...আমি অফিসে বেরুবো বাবা, আপনি বিশ্রাম করুন। জীবানন্দর বয়স পঁচিশ বছর। সেই অবধি বাড়ীতে বসে আছি···নিঃসঙ্গ...নির্বান্ধব...ইস্কুলটা হলো ...কাজ পেলুম··কিন্তু মন যেন তবু ভরতে চায় না! অস্বস্তির সীমা নেই...

শিবশঙ্কর একাগ্র মনোযোগে সদানন্দ বাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আপনাকে পেয়ে মনে হলো, আমার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর আলো-বাতাস আবার যেন গায়ে লাগলো! এ ক' বছর...আপনাকে সত্য বলচি শিববাবু, বিশ্বাস করুন, ছেলেবেলায় অহল্যা পাষাণীর গল্প পড়েছি রামায়ণে—জীবনে এ কটা বছর যেন পাষাণ হয়ে ছিলুম...আপনার স্পর্শে সে পাষাণ ফেটে আমার উদ্ধার হয়েছে!···আপনার এখানে আসি···আপনাকে এই মেয়েকে দেখে সম্ভ্রমে মাথা লুটিয়ে পড়ে···প্রাণে কত স্বপ্ন জাগে···আপনি হয়তো আমাকে

পাগল ভাববেন...কিন্তু আমি পাগল নই! যে-জীবনের স্বপ্ন দেখতুম প্রথম যৌবনে...সে জীবন হারিয়ে গিয়েছিল! মনে হয়...সে-জীবনকে ফিরিয়ে পাবো···বাঁচার মতো বাঁচতে পারবো, যদি...

কথা বাধিয়া গেল। চরম কথা! যে কথার উত্তরের উপর জীবন নির্ভর করিতেছে। বয়স হইয়াছে...অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছেন··· ফিরিয়া পিছাইয়া আসিয়া...যেখানে জীবন হারাইয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে আবার নূতন করিয়া খেই ধরিয়া যাত্রা সুরু...সত্যই কি সম্ভব নয়?

এ প্রশ্ন অনেকবার মনে জাগিয়াছে। কত বার কল্পনা করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের ত্যাগ করিবেন কেন? তা নয়। তাদের একরকম দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন...নিজে বাঁচিতে চান এবং যাকে লইয়া বাঁচা... সেই পুষ্পিতাকে লইয়া কোথাও গিয়া থাকিবেন...কাহারো সুখে বাধা দিবেন না। পুষ্পিতা যেমন ভাবে চায়, তার যাহাতে আরাম হয়, সে যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকে...শুধু তাই! কোনো দিকে তার কোথাও না কষ্ট হয়—কোথাও না বাধে...তার বেশী তিনি কিছু চান না! সংসারে তার বেশী কোনো দাবী করিবেন না।

কথায় কথায় শিবশঙ্করকে মনের কথা বলিলেন। খুব স্পষ্ট না হইলেও আভাসে-ইঙ্গিতে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া শিবশঙ্কর বুঝিলেন, সদানন্দ বাবু নূতন করিয়া সংসার পাতিতে চান এবং সে সংসার পাতিবেন পুষ্পিতাকে বিবাহ করিয়া তাকে লইয়া! সদানন্দ বাবু এ-কথাও জানাইলেন, বিষয়-সম্পত্তি হইতে ছেলে-মেয়েদের বঞ্চিত করিবেন না। তাদের না অসুবিধা হয়, এমন ব্যবস্থা কায়েমি করিয়া দিবেন... পুষ্পিতাকেও কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে না... পুষ্পিতাকে বাড়ী-ঘর, টাকা-কড়ি, গহনাপত্র—সব দিবেন! স্ত্রীলোক

যে সম্পদের কামনা করে, সব। পুষ্পিতা কোনো দিক দিয়া বঞ্চনা ভোগ করিবে না! আরো বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়স...পুষ্পিতার প্রেমে এ-বয়স তরুণের প্রাণ-শক্তিতে স্বপ্ন-কুহকে ভরিয়া তুলিবেন, মনে তার যোগ্য আবেগ আছে, অনুভূতি আছে।

সবিস্তারে সব কথা বলিয়া সদানন্দ বাবু কহিলেন—আমি কি অন্যায় প্রস্তাব করেছি মনে করেন?

বহুদিনকার রুদ্ধ আবেগ এ প্রশ্নে ফাটিয়া গেল...শিবশঙ্কর বলিলেন,—না, না, অন্যায় কি! আপনার পয়সা আছে, আপনার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে...বয়স তেমন বেশী নয়। মানুষ তো করছে এমন বিয়ে...

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—অন্য মানুষ কি জন্য আবার বিয়ে করে, জানি না...কিন্তু আমার কথা আলাদা। মানে, আমি বিবাহ করে স্ত্রী পেয়েছিলুম। মানুষ স্ত্রী কামনা করে হয়তো ছেলেমেয়ের জন্য···কিন্তু প্রথম যৌবনে আমি স্ত্রীর কামনা করেছিলুম...ভালোবাসার জন্য।···পুত্রার্থে ভার্য্যা—সে কামনা আমার ছিল না।...তবে ঐ ভার্য্যাই পেয়েছিলুম...বললুম তো—যাকে বলে প্রেয়সী, তা পাইনি...বুঝচেন তো...

শিবশঙ্কর বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন। বুড়া বয়সে মানুষ দ্বিতীয় ছাড়িয়া চতুর্থ পক্ষেও দার-পরিগ্রহ করে...তার কারণ তিনি শুনিয়াছেন, ভোগ, নয় সেবা...কিন্তু সদানন্দ বাবু বলিতেছেন···

সদানন্দ বাবুর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, হয়তো এ-কথায় সায় দিতেন···যদি...অর্থাৎ বিশ বৎসর পূর্ব্বে সদানন্দ বাবু তাঁর কাছে আসিতেন পুষ্পিতার পাণিপ্রার্থনা করিয়া।

কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পুষ্পিতার জন্ম হয় নাই তো! এখন...

পুষ্পিতা কি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবে?...

পয়সা-কড়ি, বুদ্ধি-বিবেচনা, মানুষ হিসাবে...সদানন্দ বাবুকে সে দিক দিয়া গ্রহণ করা চলে খুব। কিন্তু বয়স...পুষ্পিতার বয়স উনিশ...বড় জোর কুড়ি...সে রাজী হইবে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হইল, পুষ্পিতার বিবাহ দিতে হইবে। তাঁর নিজের বয়স হইয়াছে...কবে আছেন, কবে নাই। তিনি চলিয়া গেলে পুষ্পিতাকে কে দেখিবে? এ চিন্তা কাঁটার মতো বুকে বিঁধিয়া আছে সারাক্ষণ...পয়সা-কড়ি থাকিলে কোন চিন্তা ছিল না। আজ পয়সা-কড়ি নাই...অথচ পুষ্পিতার মত মেয়ে...যার-তার হাতে কি করিয়া তাকে সঁপিয়া দিবেন? সারা জীবন অভাবে কষ্ট পাইবে!...

সদানন্দ বাবু...মন্দ কি! বয়স? পঞ্চাশ বৎসর বয়স এমন কি বেশী! মনে পড়িল নিজের পঞ্চাশ বৎসর বয়সের কথা...জীবন ছিল আলোয় আলো! দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ...প্রাণে দোলা দিত...তবে?

সদানন্দ বাবু কহিলেন—আপনি রাগ করলেন! ভাবচেন, এই বাসনা নিয়ে আপনার সঙ্গে এত দিন মেলা-মেশা করেছি? তা নয় শিব বাবু, বিশ্বাস করুন। আমার মনে এ দুর্বুদ্ধি কখনো উদয় হয়নি...সে দুর্বুদ্ধি জাগলে বাধা দেবার কেউ ছিল না...মনে দুরভিসন্ধি নিয়ে আপনার কাছে আমি যাতায়াত করিনি। আপনাকে ভালো লাগে...আর বলেছি তো অহল্যা-পাষাণীর কথা। আপনার মেয়েকে দেখে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আমার বুকের পাষাণ ভেঙ্গে চূর্ণ হয়েছে। বাঁচার মতো আমি বাঁচতে চাইছি...ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করতে চাইছি...

শিবশঙ্কর বলিলেন—সে কথা নয় সদানন্দ বাবু...আমি ভাবছি সুস্মিতার নিজের মতামত আছে তো…

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আমি তাড়াতাড়ি কিছু করতে বলছি না...ধীরে ধীরে। তাঁকে আপনি বলবেন, তাঁর অমর্য্যাদা হবে না কোনো দিন...কোনো দিন অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবেন না...তাঁর স্বাধীনতা অটুট থাকবে…এ শুধু একটা ব্যর্থ জীবনকে বাঁচিয়ে সার্থক করে তোলা!…

নিশ্বাস ফেলিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—তাকে এ কথা বলি ..

সদানন্দ বাবু বলিলেন,— নিশ্চয় বলবেন! আমি অপেক্ষা করে থাকবো, যতদিন বলবেন ...

এশিয়াটিক পাব্লিসার্শের নাম চারিদিকে। গল্প না ছাপিয়া তারা ছাপিতেছে অভিধান, টেক্সটবুক, ম্যাপ, এবং তার উপরে শিখো করাইয়া ছেলেমেয়েদের নানা রকমের খেলার ছক্ ছাপিতেছে। গোলোকধাম খেলার ছকের ভদ্র সংস্করণ ছাপিয়াছে। এ-ছকে শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি অভদ্র ইতর ঘরগুলা স্থান পায় নাই। এ গোলোকধাম খেলিতে হয় কড়ির বদলে ডাইস লইয়া। কোম্পানী তাদের প্রকাণ্ড শোভন ক্যাটালগ পাঠাইয়াছে সহরে গ্রামে যেখানে ছেলেমেয়েদের যত স্কুল আছে, সেই সব স্কুলে এবং লাইব্রেরীতে।

এখানকার লাইব্রেরীতেও ক্যাটালগ আসিয়াছে এবং সেদিন কমিটির মিটিংয়ে এই ক্যাটালগ লইয়া নানা রকমের আলোচনা চলিয়াছিল।

আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইল, এ স্কুলের মেয়েদের জন্য গোলোকধাম প্রভৃতি কয়েকটি খেলার ছক এবং অভিধান প্রভৃতি আনানো হইবে। বই বাছিয়া ফর্দ্দ তৈয়ার করিবার ভার পড়িল পুষ্পিতার উপর।

কমিটির মিটিং ভাঙ্গিলে পুষ্পিতা আসিল নিজের ঘরে—সঙ্গে ক্যাটালগের বই। সদানন্দ বাবু স্কুলে রহিলেন—শিববাবুকে তিনি ছাড়িলেন না।

এ-কথা সে-কথার পর সদানন্দ বাবু বলিলেন—কথাটা আপনার মেয়ের কাছে তুলেছিলেন কি ?

শিবশঙ্কর বলিলেন—না, ফাঁক পাইনি। ক'দিন মেয়েদের কোয়ার্টারলি এগজামিনের খাতা নিয়ে ব্যস্ত দেখছি কি না...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—এবারে সে কথাটা একবার বলুন...

শিবশঙ্কর বলিলেন—বলবো...আজই বলবো।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তাই বলুন!...মানে, কলকাতায় একখানা বাড়ী পাচ্ছি। যার বাড়ী, তার কাছ থেকে আমার কারবারের দরুণ অনেক টাকা পাওনা...দিতে পারছে না...বাড়ীখানা দেবে আর সেই সঙ্গে সাত-আট হাজার টাকা দেবে। বাড়ীখানি লেকের কাছে। নতুন বাড়ী। সঙ্গে খালি জায়গা আছে অনেকখানি।

শিবশঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সদানন্দ বাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—যদি আমার সাধ মেটে...বাড়ীখানি নিয়ে ওঁকে দেবো বিয়ের যৌতুক...আর যা যা করবো...আপনার কাছে গোপন রাখবো না...অর্থাৎ একটা দলিল করিয়েছি। কাকেও বঞ্চিত করবো না। কেউ অভিশাপ দেবে সে ব্যবস্থা করবো না, বুঝলেন শিববাবু...

এ-কথার পর শিবশঙ্কর মরিয়া হইলেন...না, কথাটা ফেলিয়া রাখা চলে না। আজ বলিবেন!

সদানন্দ বাবুকে বিদায় দিয়া শিবশঙ্কর ঘরে আসিলেন...

ক্যাটালগ লইয়া পুষ্পিতা তন্ময়...

শিবশঙ্কর কহিলেন—একটা কথা ছিল...

পুষ্পিতা মুখ তুলিয়া বাপের পানে চাহিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন—তোমার বিয়ে দেবো ঠিক করেছি। পাত্র মজুৎ...না, নিত্য আমার এ দুশ্চিন্তা...আর নয়! কবে মরে যাবো, কে দেখবে?...না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে...

পুষ্পিতা হাসিল, হাসিয়া বলিল—দোরে রাজ-পুত্র এসে দাঁড়িয়েছে না কি বাবা?

শিবশঙ্করের কাছে পুষ্পিতা কোনদিনই রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা কহে না। আজও রাখা-ঢাকা করিল না।

শিবশঙ্কর বসিলেন, বলিলেন—অগাধ টাকা—তোমার মান-মর্য্যাদা রেখে চলবে···স্বভাব-চরিত্র ভালো···দেশের কাজে মতি আছে...কোনো দিকে ক্রটি দেখছি না···শুধু একটু বয়স হয়েছে...

পুষ্পিতার দুই চোখে কৌতুক-হাসির রেখা! সে চাহিয়া রহিল শিবশঙ্করের মুখের পানে···

শিবশঙ্কর বলিলেন—বিয়ে একবার হয়েছিল। তাতে কি! সে বৌ মরে গেছে!—ছেলে-মেয়ে আছে। তাতে কি।···তাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করে জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তুলবে।···স্ত্রীর সুখ বেচারীর ভাগ্যে কোনো দিন মেলে নি। এদিকে দেখতে শুনতেও ভালো...বুঝলে...

পিতার প্রচার-উৎসাহ দেখিয়া পুষ্পিতা হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—বুঝেছি। সে-পাত্রকে আমি জানি...

—জানো? শিবশঙ্করের প্রশ্নে একরাশ বিস্ময়।

পুষ্পিতা কহিল—জানি। সদানন্দ বাবু তো?

শিবশঙ্কর একেবারে থ! কি করিয়া পুষ্পিতা এমন সঠিক অনুমান করিল? একটা ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন,—কি করে জানলে...

যে করিয়া জানিয়াছে...পুষ্পিতার লজ্জা হইল! পুষ্পিতা বলিল,—তা শুনে দরকার কি?...আমি ঠিক বলেছি তো?

শিবশঙ্কর বলিলেন—বয়সের জন্য মনটা একটু খুঁতখুঁত করে... তবে বয়স খুব বেশী নয়... পঞ্চাশ বছর হবে। তা এ বয়সে সাহেবরা যে প্রথমবার বিয়ে করে...

হাসিয়া পুষ্পিতা কহিল—তারা বাঙালীর মেয়ে বিয়ে করে না, বাবা...তারা ইংরাজের মেয়ে বিয়ে করে।

শিবশঙ্কর যেন খুব হারিয়া গিয়াছেন! মুখে তেমনি ভাব ফুটিল। চট করিয়া তিনি এ কথার জবাব দিতে পারিলেন না।

পুষ্পিতা কহিল—হঠাৎ তাঁর এ সখ হলো কেন?

শিবশঙ্কর বলিলেন,—সখ ঠিক নয়...উনি আমাকে একদিন... বলছিলেন ওঁর জীবনের ইতিহাস। অর্থাৎ প্রথম বয়সে অনেক সখ ছিল,...কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে হলো। একেবারে নিরেট সেকেলে মেয়ে—তার উপর কাজ-কারবার। বলছিলেন, কোথা দিয়ে যে বয়স-গুলো বয়ে যেতে লাগলো—এখন বিশ্রাম চান্। তাই চান মনের মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করতে!...বললেন, ওঁর সময়ে এখনকার মতো মেয়ে মিলতো না...না বিদ্যা-বুদ্ধিতে, না কাজে-কর্ম্মে...যাকে বলে, বেশ **intelligent**। সে দুঃখ কেন মনে পোষেন?

পুষ্পিতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাপের পানে চাহিল। করুণায় মমতায় তার মন ভিজিয়া গেল। বুঝিল, দুঃখ-দৈন্যের মাঝখানে নিরুপায় হইয়া বাবা দারুণ বেদনা সহিতেছেন! সহা ভিন্ন গতি নাই... তাই! কোনো দিকে উপায় বা অবলম্বন দেখিতেছেন না, তাই...

এবং তাই পয়সার পাহাড় দেখিয়া মেয়ের আশ্রয় রচিয়া দিতে চান...

কিন্তু পয়সায় পুষ্পিতার আজ আর এতটুকু মোহ নাই! যতদিন সম্পদের গদিতে বসিয়া ছিল, ততদিন দিনগুলা কোথা দিয়া যাইত... রৌদ্র, বৃষ্টি, আলো-বাতাস...এ সব কেন আসে, কেন যায়, সে কথা মনের কোণেও উদয় হইত না...গণ্ডী-হারা অসীমে মন ছুটাছুটী করিয়া ফিরিত! মানুষ-জন যারা কাছে আসা যাওয়া করিত, তারা স্থির হইয়া বসিত না...

মনের কোনখানে কি আছে, সুখ না দুঃখ...পুলক না বেদনা, হাসি না অশ্রু—সে সবের কোনো সংবাদ রাখিত না! বাহিরের হাসি-কান্না লইয়া হাসিয়া, দুঃখ জানাইয়া তারা চলিয়া যাইত।

এখন ?

চারিদিকে ছোট গণ্ডী টানা...এ গণ্ডীতে যারা আসে, তারা নিবিড় করিয়া পরিচয় জানাইয়া দিয়া যায়! তার উপর তখন ছিল কত কি অনাবশ্যক বাহুল্য! বাহুল্যের যেন কত প্রয়োজন ছিল!...এখন সে বাহুল্য নাই। তার প্রয়োজনও অনুভব হয় না বলিয়া এখনকার জীবন তখনকার চেয়ে কত সহজ কত অনায়াস হইয়াছে।

অভ্যাসে এ জীবন আজ এমন দাঁড়াইয়াছে যে টাকা-কড়ির নামে মনে আতঙ্ক জাগে! সে ভিড়ের কথা স্মরণ হইলে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া অস্থির হইয়া ওঠে!...

মনে অতীত ও বর্ত্তমানে মিশিয়া আলো-ছায়ার খেলা চলিল... মুখে সে কোনো কথা বলিল না।

শিবশঙ্কর ভাবিলেন, মেয়ে হয়তো ধৈর্য্য ধরিয়া সকল কথা শুনিতে চায়...তাই সদানন্দ বাবুর দেহে-মনে তরুণের বর্ণলেপ মাখাইয়া, সদানন্দ বাবুকে তরুণ সাজে সাজাইয়া তাঁর অপরূপ কাহিনী শিবশঙ্কর বলিয়া চলিলেন। বলিলেন, এ দৈন্য তিনি সহিয়া আছেন নিতান্ত নিরুপায়ে। নহিলে তাঁর পরিচয় এখানে,—মেয়ে-স্কুলের কেরাণী বাবু! লজ্জায় ধিক্কারে একালে মাটির মধ্যে প্রবেশ করা যদি সম্ভব হইত, শিবশঙ্কর তাহা হইলে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতেন, মাটীর বুকে এমন করিয়া বিচরণ করিতেন না!

বহু কথার পর বিবরণ সম্পূর্ণ হইলে শিবশঙ্কর বলিলেন,—তোর ভালোই হবে। সকল দিক না বুঝে কি আর আমি এ-কথা বলছি মা...?

আমারো গায়ে একটু বাতাস লাগবে। আমি সুস্থ হবো। দু'বছর আরো বাঁচতে পারবো বলে মনে হয়...কি বলিস মা ?

পুষ্পিতার এতক্ষণ যেন চেতনা ছিল না...চিন্তার গহনে সে ছিল তন্ময়...এখন বাপের কথা কাণে শুনিল···শুনিয়া প্রশ্ন করিল—কিসের কি কথা বলবো ?

শিবশঙ্কর অবাক! পুষ্পিতার মনে পড়িল সদানন্দ বাবুর তরুণ মনের কথা বাবা বলিতেছিলেন...

শিবশঙ্কর বলিলেন—ভদ্রলোক উত্তর চেয়ে আকুল হয়ে আছেন ···তাঁকে হাঁ-না একটা কিছু বলতে হবে তো···আমাকে খাতির করেন...একজন কৃতী সম্ভ্রান্ত লোক...

পুষ্পিতা কি উত্তর দিবে ? জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে, তাহাতে স্বপ্ন, আশা, আলো, ভবিষ্যৎ...এ সবের কথা মনে জাগে না...বিবাহের কথা লইয়া কোনোদিন সে চিন্তা করিতে বসে নাই! বাবার অবর্ত্তমানে...? সে কথা ভাবিয়া যখন কূল-কিনারা মিলিবে না...মিছা ভাবিয়া লাভ ? যে করিয়া আজিকার দিন কাটিতেছে...তার ভাবনা কি কোনোদিন মনে জাগিয়াছিল ? আজিকার এ দিনের কথা তখন যদি কেহ বলিত, পুষ্পিতা হয়তো শিহরিয়া মূর্চ্ছা যাইত! কিন্তু আজিকার এ দিন আসিল...এবং কি সহজে এদিনের সঙ্গে মনের বুঝাপড়া হইয়া গেছে... কোথাও এতটুকু বাধিতেছে না তো···

শিবশঙ্কর মেয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন অনেকক্ষণ...মেয়ে তবু নিরুত্তর!

তিনি বলিলেন,—তা হলে বলিগে, মেয়ের মত নেই ?

পুষ্পিতা কহিল—তাই বলো...বলো এ বয়সে এ-পাগলামি যেন তিনি না করেন!...

—পাগলামি ?

—তাই। তাঁর পয়সা আছে বলে' তিনি ভেবেছেন, পয়সার জোরে যা খুশী, তাই করবেন,...কিন্তু তা হয় না। মেয়েদেরও মন আছে, রুচি আছে, পছন্দ আছে...তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না বাবা... আমার জন্ত তোমার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বিয়ে করার প্রয়োজন যখন হবে,...তখন তার ব্যবস্থা করো...

শিবশঙ্কর কহিলেন—আমি সে প্রয়োজন বুঝছি...

পুষ্পিতা কহিল—যদি বোঝো, তবে মানুষের মতো পাত্র এনো। উনি ভেবেছেন, ওঁর স্কুল আছে এবং সেই স্কুলে মাইনে নিয়ে পড়াই বলে' দুঃখী-মানুষ...ওঁর এ-প্রস্তাব মস্ত অনুগ্রহ বলে' মাথা পেতে নেবো ! ...তা নয়...এখন বুঝচি, তাই সেক্রেটারি সদানন্দ বাবু তোমার উপর এত সদয়...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুষ্পিতা হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।...

শিবশঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, তাই কি ? এবং পয়সা-কড়ির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও তিনি কি হারাইয়াছেন...সত্য ?

মেয়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে তাঁর আর কোনো কথা হইল না।

রান্নাবান্না চুকিলে দুজনে খাইতে বসিলেন। খাইতে বসিয়া পুষ্পিতা বলিল,—আজকের রুটি কেমন লাগলো, বাবা ?

শিবশঙ্কর কহিলেন—কেন বল্‌তো ?

পুষ্পিতা কহিল—বলো না...

শিবশঙ্কর কহিলেন—অন্য রকম স্বাদ পাচ্ছি বটে...

পুষ্পিতা প্রশ্ন করিল—ভালো ?

শিবশঙ্কর কহিলেন,—হ্যাঁ।

পুষ্পিতা কহিল—বিভাদি আনিয়ে দেছে...ওর কে বিধবা আত্মীয়া আছেন...বড় গরিব...পশ্চিমে থাকতেন, নিজের ঘরে বসে তিনি জাঁতায় আটা ভাঙেন...সেই আটা!...এ আটার গুণ আছে। খেতে ভালো...তাই আমরা যে কজন মেয়ে টীচার আছি, ঠিক করেছি, দোকানের আটা না কিনে ওঁর কাছ থেকেই আটা কিনবো। খাঁটি জিনিষ পাবো...সেই সঙ্গে বিধবারও উপকার হবে!...

শিবশঙ্কর কহিলেন—বেশ...

পুষ্পিতা কহিল—মেয়েরা যদি বুদ্ধি করে' চালায়, অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য বোধ হয় ভাবতে হয় না!

শিবশঙ্কর এ কথার কোন জবাব দিলেন না—দুধের বাটীতে রুটি ফেলিলেন।

পুষ্পিতা কহিল—কলা আছে···ভালো মর্ত্তমান কলা...কালোদাকে দিতে বলি...তুমি কলা ভালোবাসো...

১৮

টুর হইতে ফিরিয়া বিজু বাড়ী আসিল। মা বলিল,—একখানা চিঠি দিতে নেই ?

বিজু বলিল,—অবসর ছিল কি যে চিঠি দেবো !

মা বলিল—তোমার ভাবনা হতো না আমাদের জন্য...জানি,—কিন্তু আমাদের ভাবনার অন্ত ছিল না।

বেশভূষা ছাড়িতে ছাড়িতে বিজু বলিল—জলে পড়িনি। মানুষ নিয়ে গিয়েছিল যত্ন করে'···ভাবনাই বা কেন হবে, বুঝি না।

নিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিল,—তা যে বোঝোনা, সে আমার বরাতে আর কর্ম্মফলে।

বিজু বলিল—এতদিন পরে ফিরলুম, প্রথম অভ্যর্থনা যা পেলুম, চমৎকার !...সাধে হরকান্ত সা' বলে, আপনার লোকের চেয়ে পর ভালো। ...আমি চললুম চান করতে...দুটী অন্ন মিলবে ? না, আমার অন্ন মাপা নেই এখানে ?

মা এ কথার জবাব দিল না, মেয়ের পানে চাহিয়া মেয়েকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিজু বলিল—বেশ, আমার স্যুটকেশ্‌টা তোমার চাকর নিয়ে আসতে পারলো না...মর্জ্জি হলো না, বোধ হয় ?...থাক, নিজে পারি, তুলবো।

মা ধমক দিয়া বলিল—কি এমন দিগ্বিজয় করে এলে যে সকলকে মারমার করছো !...স্যুটকেশ আনে কি না, ছাখো...কবে আর নিজের হাতে নিজের কাজ করেছো !

—থাক্ থাক্...আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করো...বলিয়া বিজু বাহির হইয়া গেল।

মেজো বোন বলিল—তোমরা কোথায় কোথায় গেছ্‌লে দিদি? কেমন হলো? রোজ খপরের কাগজে দেখতুম...তোমাদের সম্বন্ধে কোনো কথা ছাপা হলো কি না দেখবার জন্য—কাগজে একটি কথা লেখা দেখিনি। খুব বাহাদুর বটে তোমাদের পাব্লিশিটি-ম্যান্!

বিজু বলিল—চান করে এসে বলবো'খন...আমোদ যা হয়েছে...তার তুলনা নেই! এ্যাদ্দিন পরে যেন সত্যিকারের লাইফ পেয়ে বেঁচেছিলুম।

স্নানাদির পর বিজু বলিতেছিল তার দিগ্বিজয়ের কাহিনী...তার গান শুনিয়া লোকে কত ধন্য ধন্য করিয়াছে। দুটো মেডেল পাইয়াছে... এখনও পায় নাই, তবে promised...তারা ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছে —মেডেলে নাম engrave করিয়া পাঠাইয়া দিবে। একটা মেডেল দিয়াছে ধানবাদের এক মার্চেন্ট লালাজী ধুধুরিয়া—আর একটা দিয়াছে হাজারিবাগের এক ভদ্রলোক, হীরেন বাগচী!...গায়ত্রী যা করিয়াছিল... অঞ্জলি-নাচ নাচিতে গিয়া আছাড়! হাসির সে কি রোল উঠিয়াছিল! আর ঐ নিভা দত্ত...কি বলিয়া আসরে নাচিতে যায়! কি বদ চেহারা... যখন এক্সপ্রেশন দেয়...মনে হয়, কাঁদিতেছে...

এমনি আলোচনার পর জানাইয়া দিল, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে নূতন আর্টিষ্ট সংগ্রহ করিয়া আর একবার টুরে বাহির হইবে—পাটনা, বেনারস, কানপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী পর্য্যন্ত। হরকান্ত সাহা পাঁচশো টাকা ফেলিয়াছিল—কোম্পানীর নেট্ লাভ হইয়াছে প্রায় বারোশো টাকা...

বাপ বলিল—তোমার আর যাওয়া হবে না...

বিজু বলিল—কেন ?

—না। লোকে আমাকে অনেক যা-তা বলে গালাগাল দিচ্ছে... লে, ভাগর মেয়ে...কোথাকার কতকগুলো হতভাগা ছোকরার ঙ্গে...

বিজু বলিল—যারা বলেছে, তাদের বলো, এ-সব হতভাগার পায়ের লো পেলে তাদের জন্ম সার্থক হবে !...কিসের জন্ত যা-তা বলবে ? আর্ট ! করাণীগিরি করে মরছে...তারা কি বুঝবে এ-আর্টের মর্ম !

বাপ অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিল।

মা বলিল—কেউ কিছু বুঝুক, না-বুঝুক, ভদ্র ঘরের মেয়ের এ বয়সে এমন হৈ-হৈ করে বেড়ানো মোটে শোভা পায় না !...বিয়ে দি তারপর া খুশী, তাই করে বেড়িয়ো, আমরা কোনো কথা বলতে াবো না...

বিজু বলিল—বিয়ে যদি আগে দিতে,...হয়তো হতো। এখন আমার বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই...

—ইচ্ছা নেই !

মায়ের বুকে যেন কে ভারী পাথর ছুড়িয়া মারিল ! কি বলিবে, মা ভাষা খুঁজিয়া পাইল না—বুকের মধ্যটা যেন ছিঁড়িয়া যাইবে, এমনি টনটন করিয়া উঠিল।

বিজু আর কোনো কথা বলিল না...

অনেকক্ষণ পরে মা বলিল—বিয়ে না করবি যদি, কি করবি শুনি ? এমনি ভাবে হল্লা করে বেড়াবি ?

বিজু বলিল—হল্লা মানে ?...

মা বলিল—সে-মানে তুমিই বোঝো বাছা...মা হয়ে কোন্ মুখে আমি সে মানে বলবো !

. বিজু বলিল—আমাকে এমন ইতর মনে করো না···আমার কাণ্ডজ্ঞান আছে।

মা বলিল—থাকলেই ভালো।

মা সে স্থান ত্যাগ করিল। এ সব কথা কাহার সঙ্গে কহিবে ? এ কথা মনে হইলে মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে থাকে !

বিজু বলিল—এক-বাড়ী লোক·· কি 'এনকোর' দিতে লাগলো ! শুধু তো সখের জন্য নয়···রোজগার করা ! আর্টিষ্ট ! ইউরোপে আমেরিকায় এক-একজন আর্টিষ্টের মান কত...ইজ্জৎ কত ! কত পয়সা তারা রোজগার করছে !···আমি যদি মামুলি ধারায় সংসারের জাঁতা-কলে মনকে পিষে ছেঁচে না মরি...তাতে কার কি বলবার আছে... !

বলিবার কথা সত্যই কাহারো ছিল না...মা আর কোনো কথা বলে নাই। বাপের কাছে মা বলিয়াছিল—ওর কোনো কথায় তুমি থেকো না। ভেবো, তোমার বড় মেয়ে মরে গেছে !

বাপ বলিল—মরে গেলে তো চুকে যেতো ! তা তো সত্যি নয়... তোমার অন্য মেয়েদের এতে অনিষ্ট হবে...

মা বলিল—আগে বোঝা উচিত ছিল···শুভেন্দুর সঙ্গে সেই মেলামেশার পর আমরা তো সাবধান হইনি।

বাপ বলিল—মানুষের সঙ্গে মানুষ মিশছে—এতে সাবধান হবো কি রকম !

মা বলিল—সে কথা সত্যি। কিন্তু সে মেলামেশায় কতখানি গণ্ডী থাকা উচিত, তা আমাদের উপদেশ দিয়ে বোঝানো উচিত ছিল··· এতখানি স্বাধীনতা...

বাপ বলিল—মেয়েদের বন্দী করে রাখতে হয়, সে জ্ঞান আমার ছিল না।

মা বলিল—বন্দী ঠিক নয়...শুধু একটু সাবধানে রাখা। আমার দোষ! আমার উচিত ছিল...ভাবতুম, ছেলেমানুষ, গান-বাজনা নিয়ে থাকে...

বাপ বলিল—শুভেন্দুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করানোর পর যদি বিয়ে দিয়ে দিতে...

মা বলিল—তুমি পুরুষ-মানুষ যদি বুঝেছিলে, সে চেষ্টা করোনি কেন?

বাপ বলিল,—ভেবেছিলুম, তুমি যদি তেমন বুঝতে, আমায় সে কথা বল্‌বে···

মা বলিল—তোমার সংসারে গায়ে পড়ে কোনোদিন্ আমি কোনো কথা বলেছি? তুমিই বলো···তুমি কর্ত্তা, যখন যা মনে করেছো, সায় দিয়ে নীচু মাথায় তাই করেছি...চিরকাল।

বাপ বলিল—অন্যায় করেছো!...আমি সংসার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলুম...তোমার উপর এদিককার ভার রেখে···

মা বলিল,—সে ভার আমার সাধ্যমতো আমি মাথায় বয়েছি... কিন্তু যা হবার, তা হয়ে গেছে, উপায় নেই। এ-মেয়েটার সম্বন্ধে যা স্থির করেছো...দেরী নয়...ঐ পাত্রটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও···এর সম্বন্ধে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হই তাহলে···

বাপ বলিল,—দেখি!...ক'দিন সে পাত্র আমার দিকে আর ঘেঁষ্ ঘ্যায়নি। বিজু যে রকম নাম করেছে···পাঁচজনে তামাসা করে...বলে, আর্টিষ্ট মেয়ে···ওকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও হে...এদেশ ওর মর্য্যাদা বুঝবে না!···প্রথম প্রথম কি ভাবতুম, জানো? মেয়ের যদি শক্তি থাকে, সে শক্তির চর্চ্চা করুক···

বাপ নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কিন্তু আমাদের দেশ সত্যই এখনো এ-বিদ্যাটাকে নিতে বা তার ব্যবহার শেখেনি...

মা বলিল,—হবে। তবু মেয়েদের আসল জায়গা হলো সংসার... আজ বিজু বুঝছে না···পরে একদিন বুঝবে···

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বাপ বলিল,—একটা কথা...

মা বলিল—কি ?

—তোমার মনে হয়, ও ভালো আছে ?

মা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—ও কথা ভাবতে আমার ভয় হয়···মনে যেন আগুন জ্বলে ওঠে !...

নিশ্বাস ফেলিয়া বাপ বলিল,—মনে আগুন জ্বললে তো চলবে না··· !

মা বলিল,—মনে হয়, অন্যায় কিছু করেনি...তা হলে এমন করে জোর গলায় তর্ক করতে পারতো না...

বাপ আবার নিশ্বাস ফেলিল, বলিল,—তুমিই জানো।···আমি যেন অকূল পাথারে পড়েছি···সংসারের বাইরের ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা করবো...তার মধ্যে অবসর কোথায় যে এ সব দিকে নজর রাখি...

মা বলিল,—ওর জন্য ভেবে মাথা খারাপ করো না ! যদি সত্যি বয়ে যায়···তুমি আমি রাখতে পারবো কি !

বাপ বলিল,—তা যদি হয় তো দোষ আমাদের। মা-বাপ হয়ে ওকে মানুষ করিনি...মানুষ করবার চেষ্টা করিনি...

১৬

সেদিন সন্ধ্যার পরে জ্বর-গায়ে শিবশঙ্কর বাড়ী ফিরিলেন, পুষ্পিতা বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—জ্বর হয়েছে মা...

পুষ্পিতার বুকখানা ধক্ করিয়া উঠিল। বাপের কপালে গায়ে হাত দিয়া পুষ্পিতা বলিল—এ যে বেশ জ্বর। কোথা থেকে নিয়ে এলে?

শিবশঙ্কর বলিলেন,—সকাল থেকে শরীরটা কেমন ভারী বোধ হচ্ছিল···সদানন্দ বাবুর ওখানে যখন গেলুম, তখন বেশ মাথা ধরেছে... দুজনে বসে খেলছিলুম...আর পারলুম না...অসহ্য যাতনা সারা দেহে···

পুষ্পিতা কহিল,—বেশ করেছো! শরীর যদি অতই খারাপ বোধ করছিলে, তবে বেরুলে কেন?

শিবশঙ্কর বলিলেন—সদানন্দ বাবুকে কথা দিয়ে এসেছিলুম···জানিস তো, সেই অবধি উনি এখানে আসা বন্ধ করেছেন!...

পুষ্পিতা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—শোবে চলো··· মাথায় আমি ওডিকলোঁ দি...

শিবশঙ্কর বিছানায় শয়ন করিলেন, পুষ্পিতা টেম্পারেচার লইল। জ্বর ১০৩।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—কত?

পুষ্পিতা বলিল,—তা বেশ ...একশোর ওপরে···

শিবশঙ্কর বলিলেন,—আমারও তাই মনে হচ্ছিল···

পুষ্পিতা কহিল,—কথা কয়ো না। ঘুমোবার চেষ্টা করো—আমি ওডিকলোঁ আনি···

ওডিকলোঁ-জলে রুমাল ভিজাইয়া পুষ্পিতা সেই পটী বসাইল শিবশঙ্করের কপালে…

কালো আসিয়া বলিল,—উনুনে আগুন জলেছে।

পুষ্পিতা কহিল,—তুমি যা হয় কিছু করে নাও কালোদা। বাবার খুব জর…আমি আজ ওদিকে যেতে পারবো না।

কালো বলিল,—জর!

পুষ্পিতা কহিল,—হাঁা। একটু-আধটু নয়…একশোর ওপরে।

কালো বলিল,—আমি ভাবছিলুম…জর না করে ছাড়বেন না। দুদিন সদানন্দ বাবুর সঙ্গে গিয়ে রইলেন কোন সে পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার সখে…তখনি বুঝেছিলুম, ম্যালেরিয়া না হয়ে যাবে না।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—অনেকদিন জর হয়নি…দুদিন ভোগাবে মনে হচ্ছে।

পুষ্পিতা কহিল,—তুমি কথা কয়ো না,…ম্যালেরিয়া যদি হয়, কিসের জন্য ভুগবে! কুইনিন ইন্‌জেক্‌সন করে দিলে দুদিনেই সেরে উঠবে…

শিবশঙ্কর আর কোন কথা বলিলেন না। কালো চলিয়া গেল রান্না ঘরে…শিবশঙ্করের মাথায় ওডিকলোঁর পটি টিপিয়া পুষ্পিতা বসিয়া রহিল…চুপচাপ।

মনে পড়িল, কলিকাতায় থাকিতে শিবশঙ্করের অসুখ করিয়াছিল… সে কবে…দুবৎসর পূর্ব্বে…

অসুখ হইলে বাবাকে লইয়া যেন রীতিমত যুদ্ধ চলে…দু'তিন বারের কথা মনে পড়িল।

তার গা ছমছম করিয়া উঠিল…এবারও যদি তেমনি হয়?

তখন পয়সা ছিল…সহর কলিকাতা…যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে কষ্ট হয় নাই। এখানে তেমন কাণ্ড ঘটিলে…কে দেখিবে?

কাহার ভরসায় কি লইয়া সে যুদ্ধ করিবে? সেখানে সেবারে নীলাদ্রি কি সাহায্যই না করিয়াছিল...

পুষ্পিতার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল!

এবং মনের এ আতঙ্ক অহেতুক হইল না। শিবশঙ্করের জ্বর বাঁকা পথে চলিয়া নানা উৎপাত-উপসর্গের সৃষ্টি করিতে লাগিল। পুষ্পিতা সামনে দেখিল অকূল পাথার!

দু'দিন শিবশঙ্করের জ্ঞান রহিল না। তৃতীয় দিনে একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন, ডাকিলেন,—সদানন্দ বাবু..

কালো পাথার বাতাস করিতেছিল, কহিল,—তিনি তো আসেন নি।

জড়িত স্বরে শিবশঙ্কর বলিলেন,—আসেন নি! তবে গজের ও-চাল কে দিয়ে দিলে?

কালো কোনো জবাব দিল না...একটা নিশ্বাস ফেলিল।

পুষ্পিতা পাশের ঘরে বসিয়া হরলিক্স তৈরী করিতেছিল... মেজার-গ্লাসে হরলিক্স লইয়া সে এ ঘরে আসিল, শিবশঙ্করকে বলিল,—এটুকু খেয়ে ফ্যালো বাবা...

শিবশঙ্কর চোখ মেলিয়া চাহিলেন—দু'চোখ জবাফুলের মতো লাল টকটক করিতেছে...

মেয়ের পানে তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মেয়ে বলিল,—এটুকু খাও বাবা...লক্ষ্মীটি...

শিবশঙ্কর বলিলেন,—না খাবো না! তুই আমার কথা শুনিস্ না, আমি কেন শুনবো?...সদানন্দ বাবুর মনখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে... বেচারী আমার কাছে কেঁদেছেন...

নিশ্বাস চাপিয়া পুষ্পিতা ডাকিল,—বাবা...

শিবশঙ্কর বলিলেন,—সদানন্দ বাবু বললেন, এ-মুখ নিয়ে আপনার বাড়ীতে আর যাবো না শিববাবু···ভালো লোকের মনে তুই বড় কষ্ট দিয়েছিস্···

পুষ্পিতা কহিল,—আর কষ্ট দেবো না বাবা...

শিবশঙ্কর বলিলেন,—তাহলে তাঁকে ডেকে পাঠাই...দু'বাজি খেলবো বসে...কেমন ? দেখিস, অসুখ আমার সেরে যাবে !

জ্ঞানে-অজ্ঞানে মিলিয়া যে আঘাতের সৃষ্টি করিল, পুষ্পিতা সে আঘাতে ভাঙিয়া পড়িল।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—কালোকে বলো...তাঁকে ডেকে আনুক গিয়ে···

পুষ্পিতা কহিল,—যেয়ো তো কালোদা।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—ভয় নেই মা...সে কথা তিনি আর মুখে আনবেন না···ভারী লজ্জা পেয়েছেন...বুঝলে...

পুষ্পিতা কহিল,—বুঝেছি বাবা !...তুমি এখন এটুকু খাও দিকিনি...তার পর সদানন্দ বাবু এলে আমরা এক সঙ্গে বসে গল্প করবো।

শিবশঙ্কর বলিলেন,—বেশ, দাও...

হরলিক্স পান করিলেন, পান করিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন।...

কালো বলিল,—কলকাতা থেকে আমাদের ডাক্তার গোবিন্দ বাবুকে বরং নিয়ে আসি দিদি...

পুষ্পিতা কহিল,—এখানকার বিনোদ বাবুকে কাল সকালেই তুমি ডেকে আনো কালোদা···আর দেরী করতে ভয় হয়···

কালো বলিল,—আমি কাল সকালে বিনোদ বাবুকে এনে বলবো, গোবিন্দ বাবুকে আনাবার কথা···বাবুর ধাত তিনি জানেন···

পরের দিন বিনোদ বাবু আসিলেন। পুষ্পিতা তাঁকে সব কথা

খুলিয়া বলিল। বলিল,—আপনার ওপর অবিশ্বাস নয়, ডাক্তার বাবু···গোবিন্দ বাবু অনেক দিন থেকেই বাবাকে দেখছেন।

বিনোদ বাবু বলিলেন,—আমার খুব মত আছে...এ জ্বর শুধু ম্যালেরিয়া বলে মনে হচ্ছে না...

কালো বলিল,—আমি তা হলে এই সকালের ট্রেনেই বেরিয়ে যাই...

পুষ্পিতা বলিল,—ট্যাক্সি করে এসো কালোদা...

বিনোদ বাবু জ্বর দেখিলেন,—১০৪। পুষ্পিতার পানে চাহিয়া বলিলেন,—কখনো নিউমোনিয়া হয়েছিল?

পুষ্পিতা কহিল,—আমি দেখিনি। শুনেছি, ওঁর বিশ বাইশ বছর বয়সের সময় হয়েছিল।

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো যদি অন্যায় না মনে করেন···

পুষ্পিতা চাহিল বিনোদ ডাক্তারের পানে!

বিনোদ বাবু কহিলেন,—মানে, কখনো ড্রিঙ্ক করতেন? বেশী মাত্রায়?

পুষ্পিতা কহিল,—করতেন। আমার মা মারা যাবার পর ছেড়ে দেছেন।

—ক বছর?

—প্রায় আট বছর হবে!

—ও!

বিনোদ বাবু কি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বলিলেন,—গোবিন্দ বাবু কখন আসবেন?

পুষ্পিতা কহিল,—জানি না। লোক পাঠাচ্ছি এখনি··যত শীঘ্র পারে, তাঁকে নিয়ে আসবে।

বিনোদ বাবু বলিলেন,—তিনি এলে আমাকে খপর দেবেন...এখন একটা মালিসের ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, বুকে-পিঠে মালিস করতে হবে!

পুষ্পিতা কহিল,—নিউমোনিয়া…?

বিনোদ বাবু কহিলেন,—এখনো নির্ভুলভাবে বলতে পারছি না! ওবেলায় বোঝা যাবে।

বিনোদ বাবু চলিয়া গেলেন।

কালো বিলম্ব করিল না…তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল কলিকাতায় গোবিন্দ বাবুর কাছে।

পুষ্পিতার চোখের সামনে সারা পৃথিবী শূন্যতায় ভরিয়া গেল… গাছ-পালা লোকজন…যেন সে সবের চিহ্ন রহিল না! সে যেন চেতনা হারাইল…

চেতনা ফিরিল বাহিরের আহ্বানে।

সদানন্দ বাবু ডাকিলেন,—কালো…

পুষ্পিতা উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিল।

সদানন্দ বাবু কহিলেন,—উনি কেমন আছেন?

পুষ্পিতা কহিল,—ভালো নয়।

সদানন্দ বাবু কহিলেন,—আমি একবার দেখতে পারি?

তাঁর স্বরে করুণ আকুতি।

পুষ্পিতা কহিল—আসুন…

সদানন্দ বাবু আসিলেন। বন্ধুর পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁর বুকের মধ্যটা অসহ্য ব্যথায় দুলিয়া উঠিল।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—দুদিন উনি যাননি বলে' আমি আসছিলুম খপর নিতে…বিনোদ ডাক্তারকে দেখলুম এ বাড়ী থেকে বেরুচ্ছেন। তার কাছে খপর পেলুম…

পুষ্পিতা কোন জবাব দিল না।

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—আপনি একলা…বড় কষ্ট হচ্ছে তো!

পুষ্পিতা নিশ্বাস ফেলিল···বুকের মধ্যে বেদনার ভারী বোঝা।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—শুনলুম, কলকাতা থেকে আপনাদের পুরোনো ডাক্তারকে আনতে কালো গেছে...ভালো কাজ করেছে!···এ বয়সে এত বড় রোগের চিকিৎসা-ভার একটি লোকের উপর রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না···

পুষ্পিতা কহিল—আপনি বসবেন?

সদানন্দ বাবু কহিলেন—যদি বলেন, বসি...

পুষ্পিতা কহিল—বসুন।···আমি একটু গরম জল করে আনি··· বিনোদবাবু বললেন স্পঞ্জিং করিয়ে দিতে···

সদানন্দ বাবু বলিলেন—একা পারবেন?

পুষ্পিতা কহিল,—একটু অসুবিধা হবে···কালোদা নেই···

সদানন্দ বাবু কহিলেন—যদি বলেন, আমি আছি। সাহায্য করতে পারি। এ-সব কাজ আমার কিছু-কিছু জানা আছে।

পুষ্পিতা কহিল—আচ্ছা···

পুষ্পিতা চলিয়া গেল। রোগীর শয্যার পাশে একখানা বেতের মোড়া টানিয়া সদানন্দ বাবু তাহাতে বসিলেন, বসিয়া শিবশঙ্করের মাথায় হাত রাখিলেন। মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো...সেটা লইয়া তাহার মধ্যে-সঞ্চিত যে জল ছিল, তাহা ফেলিয়া দিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিলেন, পরে আইস-ব্যাগ হাতে উঠিয়া আসিয়া ডাকিলেন—পুষ্পিতা...

পুষ্পিতা ছিল রান্নাঘরে···জল গরম করিতেছিল, কহিল—কি বলচেন?

সদানন্দ বাবু কহিলেন—বরফ কোথায় আছে?

পুষ্পিতা কহিল—ও...বরফ আছে বাহিরের বারান্দায় ঐ কাঠের বাক্সে।...আইস-ব্যাগের জন্য?

সদানন্দ বাবু কহিলেন—হ্যাঁ ।…আমি বরফ নিচ্ছি…আপনি জল গরম করুন !…

দু'ঘণ্টা পরের কথা ।

পুষ্পিতা কহিল—দশটা বেজে গেছে…আপনার চান করবার বেলা হলো…

সদানন্দ বাবু কহিলেন,—হোক্…কেউ না এলে আপনাকে একলা রোগীর কাছে রেখে যেতে মন সরছে না ।

পুষ্পিতা কহিল—নেয়ে-খেয়ে না হয় আবার আসবেন'খন ।

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—না…

সদানন্দ বাবু চাহিলেন পুষ্পিতার পানে…ব্যথায় আতুর…চিন্তায় কাতর…মলিন দীন পুষ্পিতার মূর্ত্তি…

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আমাকে পর মনে করবেন না…এ বিপদের সময় । ভয় নেই…আমি সে সব পুরোনো পাগলামির কথা ভুলে গেছি পুষ্পিতা…সে-চিন্তার বাষ্পও আমার মনে নেই…বিশ্বাস করুন ।

সঙ্কোচে পুষ্পিতা এতটুকু হইয়া গেল…সে কোনো কথা বলিতে পারিল না ।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—শিববাবুকে আমি ভালোবাসি…শ্রদ্ধা করি । তাঁর সেবায় যদি অধিকার পাই, আমার তৃপ্তির সীমা থাকবে না ।

পুষ্পিতার চোখের পিছনে একরাশ অশ্রু ঠেলিয়া আসিল…সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল ।

গোবিন্দ ডাক্তার আসিলেন বেলা বারোটায় । তাঁর সঙ্গে আসিল নীলাদ্রি ।

গোবিন্দ বাবুর গৃহে কালোর সঙ্গে নীলাদ্রির দেখা—শিবশঙ্করের

কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া নীলাদ্রি বলিল,—ট্যাক্সি কেন? আমার গাড়ীতে করে এখনি চলো গোবিন্দবাবুকে নিয়ে...

গোবিন্দবাবু রোগী দেখিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, শুনিয়া পুষ্পিতার প্রাণ উড়িয়া গেল! প্লুরিশি!

এ বয়সে প্লুরিশি...সকলের মুখ উদ্বেগে বিবর্ণ হইল।

গোবিন্দবাবুর এখানে থাকিবার উপায় নাই—দুবেলা আসিবেন, বলিলেন। আরও বলিলেন, পাকা নার্শ চাই···

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আমার জানা ভালো নার্শ আছেন চুঁচড়োয়। মল্লিকা রায়। আমি এখনি তাঁকে আনাচ্ছি।

নীলাদ্রি বলিল,—আমার থাকবার উপায় নেই...তবে কিছু মনে করোনা পুসি, যদি পয়সা-কড়ির দরকার থাকে...

পুষ্পিতা বলিল—আপাততঃ কোনো দরকার নাই...

নীলাদ্রি বলিল—যদি দরকার বোধ করো···

পুষ্পিতা বলিল—জানাবো।...

মল্লিকা রায় আসিল।

সদানন্দ বাবুর কথা সত্য...নার্শটি ভালো। প্রাণটুকু মেয়েলি মায়ায় ভরা—পয়সার আবরণে মুড়িয়া প্রাণকে কঠিন করে নাই।

সদানন্দ বাবু বুক দিয়া পড়িয়া রহিলেন...বাড়ীর দিক মাড়াইলেন না! পুষ্পিতা সেবা করিবে, সে খুব বড় কাজ নয়। বাপ...পৃথিবীতে তার একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন...

গোবিন্দবাবু আসিতে লাগিলেন নিত্য-নিয়মিত। তার উপরে কলিকাতার আরো দু'চারিজন ডাক্তার আসিলেন—হুগলী হইতে সিভিল সার্জ্জন আসিলেন...

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তেত্রিশ দিনের দিন শিবশঙ্কর ইহলোকের সকল দুশ্চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

পুষ্পিতার জীবন শূন্য হইয়া গেল···এত বড় জগতে সে আজ একা...

নিঃসহায়!

১৭

সদানন্দ বাবু বলিলেন—দু'মাসের ছুটি নিন। নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন।

পুষ্পিতা কোনো কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল।

নীলাদ্রি আসিয়া বলিল—এখানে কি করে' এখন থাকবে, পুসি! কলকাতায় চলো...

পুষ্পিতা কহিল—চলবে কি করে'?

নীলাদ্রি বলিল—আমি আছি...চলার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

ম্লান মৃদু হাস্যে পুষ্পিতা বলিল—তা হয় না।

নীলাদ্রি বলিল—কেন হবে না? আমার আজ কোনো অভাব নেই...

পুষ্পিতা বলিল—সেই জন্যই হয় না...

নীলাদ্রি বলিল,—পুসি...

পুষ্পিতা বলিল—তুমি বড় লোক, আমি গরীব। আমাদের দুজনের মাঝখানে আজ সাগরের ব্যবধান...

নীলাদ্রি চুপ করিয়া রহিল...পুষ্পিতা জানলা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

আকাশের গায়ে দুটো পাখী...যেন দুটি কালো রেখা!...

পুষ্পিতা ভাবিল, পাখী একা নয়...পাশে সাথী আছে।

নীলাদ্রি বলিল—এখন এ কথা বলা উচিত নয়...তবু যদি বলি, এ ব্যবধান তোমার ইচ্ছা হলেই ঘুচতে পারে...

পুষ্পিতা বুঝিল, বুঝিয়া নীলাদ্রির পানে চাহিয়া মলিন হাসি হাসিল, কহিল—সে ইচ্ছা হবার নয়...সে ইচ্ছা আর হয়তো কোনোদিন হবে না!

নীলাদ্রি কহিল,—না হোক! যদি কখনো প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করবে?...বলো···

নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিতা কহিল—করবো।...

কাজ! কাজ লইয়া পুষ্পিতা সব ভুলিয়া থাকিতে চায়···কিন্তু কাজে আজ সে সহজ সুর নাই। বোঝার মতো মনে চাপিয়া বসিয়াছে... সে চাপে প্রাণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার জো!

সদানন্দবাবু প্রায় আসেন, বসেন না—খোঁজখবর লইয়া চলিয়া যান।

বলেন,—ছুটী নিন। কোথাও ঘুরে আসুন। যদি এ কাজ নিয়ে থাকতেই হয়...মনকে ঠিক করতে হবে তো···

পুষ্পিতা কোনো জবাব দেয় না!

সদানন্দবাবু বলিলেন—এক মাসের ছুটী এমনিতেই পাবেন। মাহিনা কাটা যাবে না। তার উপর আর এক মাস নিন···আমরা কমিটী থেকে সে ছুটী মঞ্জুর করবো···

পুষ্পিতা ভাবিল, তাই করিবে। ছুটী লইবে। না হইলে মনের এ-অবস্থায় পড়ানোর কাজ চলে না

ছুটী লইয়া পুষ্পিতা গেল পুরী। পুরীতে সদানন্দ বাবুর ছোট একখানি বাড়ী আছে—সমুদ্রের ধারে।

সদানন্দ বাবু ছাড়িলেন না···বলিলেন,—না। আপনার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে' আমার কথা রাখুন...অন্য কোনো দাবী এর মধ্যে নেই...আমায় বিশ্বাস করুন।

পুষ্পিতা এ কথা ঠেলিতে পারিল না।

উদাস মনে সমুদ্রের তীরে আসিয়া বসে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া তীরে লুটাইয়া পড়ে—তার এক তিল বিরাম নাই!

বসিয়া বসিয়া পুষ্পিতা ভাবে, এত ঢেউ সাগরের বুকে কোথা হইতে আসিয়া জমিল! পলকে উদয়, পলকে লয়—এ ঢেউ সাগর কেন তোলে! ঢেউয়ের এ কলোচ্ছ্বাসে সাগর কি কথা বলিতে চায় মাটীর পৃথিবীকে?

সেদিনও সমুদ্রের তীরে বসিয়া ঢেউ দেখিতেছিল—দূরে কে গান গাহিতেছে—

ঢেউ কয়ে যায় ছলছলিয়ে—
মিছে আশায় মন ছলি যে।
ওগো সুদূর, দূর গলিয়ে
কাছে এসো, আঁখি ঝুরে!

আশা! মিছা আশা?

কিসের আশা! পুষ্পিতা কোনো আশার ধার ধারে না! কে ও সুদূরকে ডাকিতেছে,—কাছে এসো...

পুষ্পিতার সুদূর··· ?

অতীত? ভবিষ্যৎ? অতীতকে ডাকা বাতুলতা! ভবিষ্যৎ? সে কেমন...কি তার মূর্ত্তি? পুষ্পিতার ভয় হইয়া গিয়াছে...না-জানাকে ডাকিতে সাহস হয় না! না-জানা ভবিষ্যৎ কত বেশে কাছে আসিতেছে···

একটা বড় নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিতা ভাবিল, নিত্য এখানে বসিয়া ঢেউ দেখি,—কি লাভ? দিনের পর দিন আসে...চলিয়া যায়...সেগুলা না দেয় প্রাণে-মনে এতটুকু পরশ! সেও কোনোদিন

এ-সব দিনগুলার পানে তেমন করিয়া চাহিয়া দেখিল না তো! খাওয় ঘুমানো আর বসিয়া থাকা··· মন যে পাথর হইয়া যাইবে!

সহসা দেখে, সামনে এক তরুণ ও তরুণী...দাঁড়াইয়া আছে সাগরে পানে চাহিয়া।

তরুণ বলিল—ভয় নেই···আমার হাত ধরে জলে নামবে...ভালে লাগবে'খন!

তরুণী বলিল,—আমার নিজের জন্য ভয় করি না গো...ভয় তোমা: জন্য।

তরুণ বলিল—তার মানে?

তরুণী বলিল—আমায় দেখবে? এখনি ঐ ঢেউয়ের মুখে নেমে যাবো'খন...তোমার নামা হবে না।

তরুণ হাসিল,—হাসিয়া কহিল—আমি যদি ডুবে যাই? না?

তরুণী বলিল,—সাগর বড় নিষ্ঠুর—কবিতায় পড়োনি?

তরুণ বলিল,—যত নিষ্ঠুর হোক, তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করে' তোমাকে সে নিঃসঙ্গ করবে না...এসো।

তরুণী বলিল—না···

তরুণের হাত সে চাপিয়া ধরিল।

তরুণ বলিল—তুমি হাসালে!

তরুণী কহিল—হাসাচ্ছি, ভালো হচ্ছে না—বটে? কাঁদাই যদি, বেশ লাগবে তোমার?

—তার মানে?

তরুণী বলিল—ছুটে গিয়ে ঐ ঢেউয়ের মুখে ঝাঁপ দেবো—দেখবে?

তরুণ কহিল—থাক, সমুদ্র-স্নানে আর কাজ নেই!—চলো, বেড়াতে বেড়াতে স্বর্গদ্বার অবধি যাই।

দুজনে চলিয়া গেল। তাদের কথা পুষ্পিতা শুনিল···সবটুকু।

তারা চলিয়া গেলে পুষ্পিতা তাদের পানে চাহিয়া রহিল···তরুণ-তরুণী দূরে ভিড়ে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

পুষ্পিতা আবার নিশ্বাস ফেলিল।···এ' নিঃসঙ্গতা বুকে বসিয়া ব্যথা দিতেছিল।

পুষ্পিতা উঠিল, ভাবিল, ক'দিন এখানে আসিয়াছি, কিছুই দেখিলাম না! কালোদা অত করিয়া বলিল, মন্দিরে চলো দিদি···পুরুষোত্তম দেখিয়া আসি···পুষ্পিতা যায় নাই। বলিয়াছিল, লোকে বলে পুরুষোত্তম না ডাকিলে তাঁর কাছে কেহ যাইতে পারে না কালোদা। কালোদা জবাব দিয়াছিল—বেশ, তবে বসে থাকো...তিনি ডাকবেন, নিশ্চয়!·· বুঝলে দিদি...তিনি না ডাকলে পুরীতে কারো আসা হয় না!

বেলাভূমির উপর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পুষ্পিতা অনেক দূর চলিয়া গেল। এক জায়গায় সাহেব-মেমের ভিড়। আট-দশজন মিলিয়া সাঁতারের পোষাক পরিয়া জলে পড়িয়া মাতন তুলিয়াছে! যেন জলের জীব—আনন্দের বিহ্বলতায় প্রমত্ত! বয়সে সকলে তরুণ···

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুষ্পিতা তাদের মাতন-লীলা দেখিল। তারা জল ছাড়িয়া উঠিতে চায় না...

পুষ্পিতা আরো অগ্রসর হইয়া চলিল।

ফ্ল্যাগষ্টাফের অনেকখানি আগে আসিয়াছে···সমুদ্র-তীরে বালির উপরে মাঝে মাঝে ভিড়···অনেক পিছন হইতে কে ডাকিল—পুসি...

পুষ্পিতা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। এক তরুণী ভিড়ের মধ্য হইতে উঠিয়া তাহার দিকে আসিতেছে...

পুষ্পিতা চিনিল···বিজু।

বিজু কাছে আসিল, বলিল—তুমি তাহলে বেঁচে আছো!

পুষ্পিতা কহিল,—আছি।

বিজু কহিল—এখানে কবে এসেছো ?

—দশ-বারো দিন।

—আছো কোথায় ?

—'নীল-সায়র' বলে যে-বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে।

—বাবা এসেছেন ?

পুষ্পিতা কহিল—বাবা নেই...

বিজু অর্থ বুঝিল না...সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পুষ্পিতা কহিল—মারা গেছেন···

বিজুর বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল।

পুষ্পিতা কহিল—তুমি এখানে এসেছো কবে ?

বিজু কহিল—আজ দু'দিন।

—একলা ?

বিজু এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল—না। দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। আছি ইণ্ডিয়ান হোটেলে।

পুষ্পিতা কহিল—ক'দিন থাকবে ?

বিজু বলিল—যদি ভালো লাগে, দু'হপ্তা।...

পুষ্পিতা কহিল—অক্ষয় বাবুর খপর কি ?

—জানি না।···

—বিয়ের কি হলো ?

—ভেবে দেখেছি, হতে পারে না। সে ভারি অভদ্র ইতর...মানে, মেয়েদের মান-ইজ্জতের দাম বোঝে না।

পুষ্পিতার ভালো লাগিল না...এই সমুদ্র-তীরে এতখানি উদারতার মাঝখানে এই ছোট কথা...অসহ্য !

বিজু কহিল—কাল যাবো'খন তোমার ওখানে। 'নীল-সায়র' বললে না ?…মল্লিকদের-বাড়ীর কাছে তো ?

পুষ্পিতা কহিল—তা আমি জানি না।

বিজু বলিল—আর কে আছে ?

পুষ্পিতা কহিল—কালোদা আর আমি …দুজনে আছি।

—বিয়ে করবে না ?

পুষ্পিতা কহিল,—সে কথা ভেবে দেখবার মতো মনের অবস্থা নয়, তার অবসরও নেই…

বিজু বলিল—আসি এখন। বন্ধুরা বসে আছে…

পরের দিন বিজু আসিয়া দেখা দিল নীল-সায়রে। সঙ্গে কলিকাতার সেই বন্ধু হরকান্ত সা।

পুষ্পিতা যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

হরকান্ত কহিল—এ বাড়ীটা না সদানন্দ বাবুর ?

পুষ্পিতা কহিল—হ্যাঁ।

বিজু বলিল—তিনি কে ?

পুষ্পিতা কহিলেন—বাবার বন্ধু ছিলেন। আমি যে স্কুলে কাজ করছি, সেই স্কুলের সেক্রেটারী।

হরকান্তর পানে চাহিয়া বিজু বলিল—তুমি যাও তা হলে…আমরা বসে গল্প করি। কতকাল পরে দেখা হলো…

হরকান্ত কহিল—পথ চিনে যেতে পারবে ?

হাসিয়া বিজু বলিল—ভয় নেই…ইণ্ডিয়ান হোটেলের পথ আমি ভুলবো না…হারিয়ে যাবো না…

হরকান্ত চলিয়া গেল।

দু'জনে বসিয়া গল্প করিল। বিজু বলিল, তার জীবনের কাহিনী

গানের বেশাতি করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার হইতেছে। হরকান্ত সার অনেক পয়সা—আর্টের উপর ভারি ঝোঁক। গ্রামোফোনে সম্প্রতি বিজু রেকর্ড দিয়াছে অনেক; এবং হরকান্ত একটা মিউজিকাল ট্রুপ তৈয়ার করিতেছে...সারা ভারতবর্ষে অভিযানে বাহির হইবে...

পুষ্পিতা কহিল,—বাড়ীর খপর কি?

বিজু বলিল—সে খপর রাখি না ভাই। তারা আমাকে ছেঁটে দেছে। পঞ্চাশ টাকা মাহিনার এক কেরাণীকে বিয়ে করতে বলেছিল... কিন্তু অক্ষয়ের সেই ব্যবহারের পর বিয়েতে আমার রুচি নেই! পুরুষ-মানুষগুলো...সত্যি পুসি, cad!...তাদের সঙ্গে যেটুকু মেলামেশা করা, শুধু স্বার্থের জন্য! নিজেদের স্ত্রী রাখা উচিত...no slavery!

বিজু আরো অনেক কথা বলিল। বলিল, পুরুষ-মানুষগুলোকে সে খুব চিনিয়াছে! কাহারো হাতে জন্মের মতো ধরা দেওয়া নয়...তার অর্থ দাস্য! তা নয়...তবে তাহাদের বোকা বানাইয়া নিজের স্বার্থ যতখানি উদ্ধার করা যায়···বিজু সে-বিদ্যা ভালো করিয়া শিখিয়াছে।

কথা শুনিয়া পুষ্পিতা শিহরিয়া উঠিল—কোনো প্রতিবাদ তুলিল না ...চুপ করিয়া বিজুর অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া গেল...

বেলা দশটা বাজিল। বিজু বলিল,—তাহলে উঠি ভাই...। পরে আবার দেখা হবে'খন...মানে, কাল যাচ্ছি ভুবনেশ্বর···যাবে?

পুষ্পিতা কহিল—না।

বিজু কহিল,—তুমি ভারী বদলে গেছ! দেখ্‌লে সে পুষ্পিতা বলে চেনা যায় না।

মৃদু হাস্যে পুষ্পিতা কহিল—বদলাবার কারণ ঘটেনি?

—বুঝি ভাই...তা বলে মন-মরা হয়ে জীবনটাকে নষ্ট করবে? ছেলেবেলায় পড়েছো তো—The mind in its own place··আমি

আমার মনকে একেবারে full controlএর মধ্যে এনেছি... কোনো কিছুতে মন আর অস্থির আকুল হতে পারে না...

বিজু চলিয়া গেল।...

দু'দিন পরে বিজু আসিয়া নিমন্ত্রণ করিল পুষ্পিতাকে...চায়ের ছোট আসর ...পুরানো বান্ধবী...

পুষ্পিতা সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল।

আসিয়া দেখে, বিজু বিছানায় শুইয়া আছে। মাথার শিয়রে বসিয়া হরকান্ত সা বিজুর মাথা টিপিয়া দিতেছে...

বিজু বলিল—তিন ঘণ্টা ধরে সমুদ্রে পড়ে ছিলুম···বেলা তখন এগারোটা। মাথা এমন ধরেছে...বসো ভাই ঐ চেয়ারখানা টেনে···

হরকান্ত বলিল—বারণ করলুম···সাঁতারের নতুন কষ্টুম এলো কলকাতা থেকে···তার লোভ সামলাতে পারলে না!

বিজু বলিল—তুমি পেরেছিলে? তুমি কেন জলে নামলে? তাইতো আমি নামলুম...তুমি যে বাহাদুরী নেবে, তা কেন সইবো?

হরকান্ত বলিল,—কিন্তু তোমায় তখন যা দেখাচ্ছিল...simply charming, সত্যি!

বিজু বলিল—তুমি উঠতে দিলে কৈ? জল থেকে উঠে গিয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে দাঁড়ালে, ঐ পোষাকে আমার ছবি তুলবে বলে...তাইতো আমি জলে পড়ে রইলুম।

হরকান্ত বলিল—ছবি তুলতে দিতে হলো তো সেই...কেন তবে গোড়ায় আপত্তি তুলেছিলে···?

বিজু বলিল,—আনো তো সে ছবি···প্রিণ্ট দিয়ে গেছে···পুসিকে দেখাই...

হরকান্ত গেল পাশের ঘরে ছবি আনিতে...

বিজু কহিল,—খেলাচ্ছিলুম...তা বোঝে না! এইতো পুরুষমানুষের বুদ্ধি...এই বুদ্ধি নিয়ে আবার বড়াই করে...

পুষ্পিতা এ কথার কোন জবাব দিল না, বলিল,—চায়ের আসর তা হলে বন্ধ?

বিজু বলিল—না, না, এখনি ব্যবস্থা করছি···

বিজু উঠিল, কহিল—হরকান্ত **is in love with me...madly in love**...বলে, বিয়ে করো...আমি বলি, না...**charm would instantly vanish.** লোকটার পয়সা-কড়ি আছে বেশ।

পুষ্পিতার মন রী-রী করিয়া উঠিল···কোনো মতে এস্থান ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচে! আসিয়া যে অন্তরঙ্গতা দেখিয়াছে, একদণ্ড তিষ্ঠিবার বাসনা নাই।

হরকান্ত আসিল। তার হাতে ফটো। বিজু তার গায়ের উপরে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কহিল—ও ছবি আমি ছিঁড়ে ফেলবো। ককখনো রাখতে দেবো না।

হরকান্ত কহিল—কিন্তু ফিল্ম-নেগেটিভ আছে। এ-ছবি ছিঁড়লেও পার পাবে, ভেবো না...

ছবি কাড়িয়া বিজু দেখিল···তারপর পুষ্পিতার সামনে ধরিয়া কহিল,—দেখেছো ভাই, এ ছবি···সত্যি, আমার লজ্জা করছে···কি রকম অসভ্য!

পুষ্পিতা ছবি দেখিল, দেখিয়া বলিল,—বেশ হয়েছে। কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা করো ভাই, আমার আবার কাজ আছে, স্কুলের একটু কাজ এসে পড়েছে।

একমাস কাটিয়া গেল। পুষ্পিতার কিছু আর ভালো লাগে না। কালোকে ডাকিয়া সে বলিল,—ফিরে যাই চলো কালোদা...আর ভালো লাগছে না।

কালো বলিল,—পুরুষোত্তম দেখবে না?

পুষ্পিতা কহিল—বেশ, আজই দেখে আসি চলো। তার পর গোছগাছ করো...কাল ফিরে যাবো।

কালো বলিল,—ছুটির তো এখনো একমাস বাকী...

পুষ্পিতা কহিল—আর একমাস এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো। এর চেয়ে ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজ করি...কাজ করলে ভালো থাকবো।

কালো বলিল—তাই করো।

পুষ্পিতা স্কুলে ফিরিয়া আসিল। সদানন্দ বাবু কহিলেন,—শরীর আরো খারাপ হয়েছে দেখচি...

পুষ্পিতা কহিল,—ভালো লাগলো না। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো!

সদানন্দ বাবু বলিলেন—একটা কথা ছিল। আপনার বাবা আমার হাতে মস্ত ভার দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব দায় আমার...অবশ্য আজ তাঁর অবর্ত্তমানে।

পুষ্পিতা তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—একটি ভাল পাত্র আছে···আই-সি-এস্··· বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর···বিয়ে-থা হয়নি যোগ্য পাত্রীর অভাবে।

আপনার কথা তাঁকে বলেছি—তিনি তাই দেখা করতে চান। ছিলেন নোয়াখালিতে। দু'মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন বিয়ে করবার জন্য।

পুষ্পিতা কহিল,—কিন্তু...

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—ঘটকের কাছে খপর পেয়ে তাঁর সঙ্গে কাল গিয়ে দেখা করেছিলুম। এখন আপনার অনুমতি পেলে তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করি। অবশ্য সে নিমন্ত্রণে কোন রকম আড়ম্বর থাকবে না। তিনি যেন আসছেন আমাদের স্কুল দেখতে, বন্ধুভাবে।

পুষ্পিতা কহিল—না!

সদানন্দ বাবু বিস্ময় বোধ করিলেন, কহিলেন—পাত্রটির স্বভাব-চরিত্র ভালো···

পুষ্পিতা কহিল,—না।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তবে থাক্, কিন্তু ভেবে দেখবেন। তাড়া খুব নেই। হলে সকল দিকে ভালো হবে...মাষ্টারী করে জীবন কাটাবেন আপনি—এ কথা ভাবলে আমার কষ্টের সীমা থাকে না।...তাছাড়া তা হয় না...হতে পারে না।

পুষ্পিতা কহিল,—দেখা যাক, যত দিন চলে...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তার পর? আমি থাকবো না...আরো বেশী বয়স হলে...মানে, সংসারের পাঁচটা কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে...

পুষ্পিতা কোনো জবাব দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—বিয়ে করতে হবে আপনাকে···তবে আমার জোর নেই। আমি যে জোর করছি, এ আপনার বাবার প্রতিনিধি হয়ে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে এ পাত্র নিয়ে আমি জোর করতুম। আপনি রাগ করবেন না, ভেবে কাল আমাকে জবাব দেবেন কিম্বা পরশু।

পুষ্পিতা গাঢ়স্বরে বলিল—দেবো জবাব।

সদানন্দ বাবু কহিলেন,—আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হলে আমি নিশ্চিন্ত হবো...পরলোকে যদি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হয়, তাঁকে খুশী করতে পারবো।

আর একদিনের কথা।

গ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত। স্কুলের মেয়েদের মধ্যে দু'দশজন ছাড়া সকলেই জ্বরে পড়িয়াছে...স্কুল খালি। সেক্রেটারী বলিয়া পাঠাইলেন, স্কুল বন্ধ থাকুক।

পুষ্পিতার বিপদ! একা থাকিতে পারে না। আকাশ নামিয়া আসিয়া যেন বুকের উপর চাপিয়া বসে!

কালোকে বলিয়া পুষ্পিতা চলিল কলিকাতায়। কালো বলিল—সন্ধ্যার আগে ফিরে এসো দিদি...না হলে ভাবনার সীমা থাকবে না।

পুষ্পিতা বলিল—গাড়ী চাপা পড়বো নাকি?

কলিকাতায় আসিয়া পুষ্পিতা ট্রামে চড়িয়া এপথে ওপথে ঘুরিয়া বেড়াইল, কোথায় যাইবে ঠিক করিতে পারিল না। পুরানো আত্মীয়-বন্ধুর কথা মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে মন চমকিয়া উঠিল। সুদিনে তারা ছিল বন্ধু—আজ দুর্দ্দিনে তারা যদি চিনিতে না পারে... পারিলেও যদি তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে?...তাই কোথাও যাওয়া হইল না!

একবার মনে হইল, আজন্মের গৃহ···তার আজ কেমন বেশ, দেখিয়া আসিলে হয়...

ট্রাম হইতে নামিয়া দু'পা অগ্রসর হইল। ঐ সে দোকান...এখন আকারে বড় হইয়াছে—সমৃদ্ধির দীপ্তিতে তার সে অতীতের দৈন্য ঢাকিয়া মুছিয়া গিয়াছে! একটা কাঠের গোলা ছিল...নাই। সেখানে আজ

পেট্রোলের সুদৃশ্য ডিপো বসিয়াছে।...ঐ সে খাবারের দোকান—বস্তীর কামারশালা...পরিচিত দু'একখানা মুখ···

পুষ্পিতা আর অগ্রসর হইতে পারিল না...ফিরিল।

মোড়ের উপরে সশব্দে ব্রেক কষিয়া একখানা বড় মোটর থামিল। ...মোটর হইতে নামিল নীলাদ্রি।

নীলাদ্রি বলিল—বাড়ীতে গিয়েছিলে?

পুষ্পিতা কহিল—কার বাড়ীতে যাবো?

নীলাদ্রি কহিল—তবে?

পুষ্পিতা বলিল—এমনি একবার কলকাতায় এসেছিলুম···

নীলাদ্রি বলিল,—এসো আমার গাড়ীতে...আমাদের অফিস দেখে যাও···তোমার স্কুলেও আমাদের বই আর ম্যাপ যাচ্ছে।

পুষ্পিতা প্রত্যাখ্যান করিল না,—নীলাদ্রির সঙ্গে তার মোটরে উঠিয়া বসিল।

দুজনে আসিয়া নামিল এশিয়াটিক পাব্লিশার্সের অফিসে। সার্কুলার রোডের উপর মস্ত বাড়ী। লোকজনের কলরব, যন্ত্রের ঘড়ঘড়ানি-শব্দ... বিরাট কর্ম্মশালা।

দোতলায় নীলাদ্রির ঘর। বড় টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজ-পত্র।

নীলাদ্রি একখানা চেয়ার টানিয়া পুষ্পিতার পানে চাহিয়া বলিল, —বসো...

পুষ্পিতা বসিল।...

লোকের পর লোক আসিতেছে...কেহ উপদেশ লইতেছে, কেহ কাজ দেখাইতেছে, কেহ আসিতেছে উমেদারী করিতে, কেহ-বা অভিযোগ লইয়া...

নীলাদ্রি ডাকিল—বেয়ারা...

বেয়ারা আসিল। নীলাদ্রি বলিল—আধ-ঘণ্টা ব্যস্ত থাকবো। কেউ যেন না আসে...

বেয়ারা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

নীলাদ্রি বলিল—বলো? কি খাবে? চা? না, সরবৎ? সেই সঙ্গে···

পুষ্পিতা কহিল—শুধু একটু চা—আর কিছু নয়।

নীলাদ্রি বলিল—বেশ...

চায়ের অর্ডার দিয়া নীলাদ্রি বলিল,—আর কতকাল এ অজ্ঞাতবাস ভোগ করবে?

—অজ্ঞাতবাস!

—তা নয় তো কি! আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে এ ভাবে বাস করার কারণ?

—কে বলেচে, সম্পর্ক তুলে দিয়েছি! নিজের দিন কাটাতে হবে তো...তার উপায়...

নীলাদ্রি বলিল—কার উপর অভিমান করে' এ ব্রত নিয়েছো, পুষ্প? ···আমি রয়েছি···আমার সঙ্গে একবার কথা কইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো?

—তার মানে?

নীলাদ্রি কহিল—তোমার সঙ্গে কোনোদিন বোধ হয় কোনো রকম অন্যায় আচরণ করিনি...কিন্তু সে কথা যাক্—তুমি জানো বোধ হয়··· আমাদের এ কারবার বেশ ভালো চলছে···

—শুনেছি...

—ভাবচো, আমি খুব সুখে আছি?

—থাকা উচিত। নয়?

নীলাদ্রি বলিল,—না।

—কেন, না?

নীলাদ্রি বলিল—মানুষ যন্ত্র নয় যে শুধু কাজ করবে। যন্ত্রের গুণ, হয় কাজ করবে—নয় চুপচাপ পড়ে থাকবে। তার মন নেই...তৃপ্তিও সে চায় না। মানুষের মন আছে। কাজের পর সে মন চায় একটু সুখ, একটু আরাম।

পুষ্পিতা বলিল—বুঝতে পারলুম না।

নীলাদ্রি বলিল—তুমি জানো, আমি এখনো বিবাহ করিনি···?

—এত কাজের ভিড় যে তার অবসর মিলছে না...?

—অবসর মেলে। কিন্তু স্ত্রী বলে' বরণ করবো এমন কাকেও মিলছে না।

—কোথায়-কোথায় সন্ধান করেছো?

নীলাদ্রি বলিল—নিজের মনে।

—সেখানে পাবে কি করে? এ যে তোমার আশ্চর্য্য কথা!

পুষ্পিতা আবার হাসিল।

নীলাদ্রি বলিল—মনের মধ্যে সন্ধান করতে হচ্ছে না... ই রয়েছে সে পাত্রী···

—বটে!···

নীলাদ্রি বলিল—তুমি এসো পুসি···তোমাকে আমার দরকার... পাশে। এত কাজের ভিড়েও তুমি এসে দাঁড়াচ্ছো আমার মনে —সকালে···সন্ধ্যায়···বুঝলে!

পুষ্পিতা কহিল—আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়...

—কেন নয়? আজ আমার দৈন্য নেই, অভাব নেই...আমি আজ

..আমার অনেক টাকা হয়েছে—তোমার কোনো কষ্ট হবে না···
তামাকে সুখে রাখতে পারবো।

নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিতা কহিল—আমি আজ ভিন্ন পথের পথিক...
। পথে চলে পয়সা-কড়িকে তুচ্ছ বলে জেনেছি।···

নীলাদ্রির দু'চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের রাশি।

পুষ্পিতা কহিল—পয়সাতে আমার ভয় জন্মেছে...সত্যি। দরকারের
উপর এক পয়সা আমি কামনা করি না।...বিলাস-ভূষণ? মনে হয়,
ত সে সব ছেড়ে থাকতে পারি, দুঃখ-কষ্টের ভয় ততই যেন কম হবে!...
অথচ একদিন...তুমি জানো, বিলাসে আমার কি ভয়ঙ্কর মোহ
ছিল...

···দুজনে বসিয়া অনেক কথা কহিল। নীলাদ্রি বলিল, পুষ্পিতাকে সে
কি নিষ্ঠাভরে চাহিয়া আসিতেছে চিরদিন...পয়সা-কড়ির দিকে অনেক-
খানি অনিশ্চয়তা ছিল বলিয়া মুখে সে প্রার্থনা তোলে নাই···তারপর
সুরু হইল দুশ্চর তপস্যা...

পুষ্পিতা কহিল—তুমি নিজের মনের কোনো পরিচয় জানো না,
নীলাদ্রি। তুমি আমাকে চাওনি কোনোদিন...স্ত্রী বলে...তুমি
চেয়েছিলে, তোমার বহুদিনের বন্ধু আমি...পাশে থেকে তোমার শক্তি
সম্পদ দেখে আশ্চর্য্য হবো—তোমার তারিফ করবো···আমাকে
দানে দানে পূর্ণ করে তুমি আনন্দ আর গর্ব্ব উপভোগ করবে...!
স্ত্রীকে মানুষ পয়সা-কড়ি দিয়ে ভালোবাসে না...তাই আমার ভয় হয়,
পয়সার দাপ্ত করে ভালোবাসাকে বিষিয়ে মেরে ফেলছি! এখন
আমরা যাকে বলি ভালোবাসা...সে ঠিক ভালোবাসা নয়...সে দর্প, সে
অহঙ্কার!...

নীলাদ্রি বলিল—তুমি তা হলে কি স্থির করেছো···শুনি!

—কিসের সম্বন্ধে ?

—বিবাহ ··

নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিতা কহিল—আর একদিন তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, জবাব দিয়েছিলুম। আজো আমার সেই জবাব... বিয়ে করবো না, এমন পণ করিনি···বিবাহের প্রয়োজন যদি বুঝি কোনোদিন...বিবাহ করবো।

নীলাদ্রি কহিল—সে প্রয়োজন কতদিনে বোধ করবে ?

—জানি না। হয়তো কাল···হয়তো দশদিন পরে...হয়তো দশ বৎসর পরে···হয়তো বা কোনোদিনই সে প্রয়োজন বোধ করবো না!

নীলাদ্রি চাহিয়া রহিল অনিমেষ দৃষ্টিতে পুষ্পিতার পানে...

পুষ্পিতা হাসিল, হাসিয়া কহিল—কি দেখচো ?

—তোমাকে।

—আমার মধ্যে নতুন করে দেখার কিছু আছে ?

—আছে।

—সত্য ? নতুন কি দেখলে ?

নীলাদ্রি বলিল—পুষ্পিতায় আজ সে পুষ্পিতা নেই···

—কে আছে তবে ?

পুষ্পিতার মুখে সেই হাসি...

নীলাদ্রি বলিল—পাষাণ !

পুষ্পিতা ক্ষণেক স্তম্ভিত-স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিল—তাই। মাঝে মাঝে আমার নিজেরো মনে হয়, বুকের মধ্যে প্রাণ নেই, মন নেই...বুকখানা সত্যই পাথর হয়ে গেছে...

—ও পাথর আমি গলিয়ে দিতে পারি...

ম্লান হাস্যে পুষ্পিতা বলিল—দরকার নেই।

—কেন দরকার নেই? দুঃখ-দুর্দ্দশা মানুষ ভোগ করে···তা বলে তাতে তোমার মত কেউ পাথর বনে না···

পুষ্পিতা কহিল—আমি ইচ্ছা করে পাথর বনিনি। দারুণ নিঃসঙ্গতার চাপে আমার মন পাথরের নীচে কোথায় যে চাপা পড়ে গেল···ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না।···আমি আর বসবো না, তোমার কাজ আছে ...তাছাড়া কালোদা বলে দেছে, সন্ধ্যার আগে ফিরতে...না হলে সে ভাববে।

নীলাদ্রি বলিল—আমি তোমাকে গাড়ী করে পৌছে দিয়ে আসবো'খন। আর একটু বসো···

পুষ্পিতা কহিল—বসে কোনো লাভ নেই...আজ আসি। তুমি কাজ করো...যদি তেমন দুর্দ্দিন আসে, হয়তো এসে আশ্রয় চাইবো...সে আশ্রয় দেবার সামর্থ্য যেন তোমার এমনি থাকে...

এ কথার পর পুষ্পিতা আর বসিল না...

পুষ্পিতা বাড়ী ফিরিল সন্ধ্যায়। ফিরিয়া যে সংবাদ শুনিল···

কালো বলিল, পাড়ায় হুলুস্থূল কাণ্ড। সদানন্দ বাবু গিয়াছিলেন চুঁচুড়ায় বড় ছেলের জন্য পাত্রী দেখিতে। নৌকায় ফিরিতেছিলেন... নৌকায় ছিলেন তাঁর দুই পুত্র এবং তিনি। এপারের কাছে আসিয়াছেন এমন সময়ে একখানা মোটর লঞ্চ সবেগে আসিয়া নৌকায় ধাক্কা দেয়। নৌকা উল্টাইয়া যায়। বড় ছেলের সন্ধান নাই...ছোট ছেলেকে বুকে ধরিয়া সদানন্দ বাবু কোনোমতে তীরে আসিয়া উঠিয়াছেন। দুজনের অবস্থাই খারাপ—তাঁদের দুজনকে কলিকাতার হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে···

পুষ্পিতার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল···দু'পা অবশ···পুষ্পিতা বারান্দার মেঝেয় বসিয়া পড়িল।...

রাত্রি প্রায় নটা। কালো রান্নাঘরে...পুষ্পিতা বারান্দায় বসিয়া আছে ...বিমূঢ়ের মতো...আকাশে কালো কালো মেঘের ছায়া।

পুষ্পিতা ডাকিল—কালোদা...

কালো কহিল—কেন?

—তুমি শীগগির খেয়ে নাও। নিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো...লক্ষ্মীটি...! ওঁদের খপরের জন্য আমার মন ভারী আকুল হয়ে রয়েছে···

কালো কহিল—এখান থেকে অনেকে গেছেন দিদি—কেউ সঙ্গে গেছেন, কেউ গেছেন পরে...শুনছিলুম, বলেছিলেন, দু' ছেলের বিয়ে

য়ে অনেক টাকা দান করবেন এই স্কুলে...আর তুমি হবে স্কুলে সবার পর কর্ত্তা!

পুষ্পিতা কহিল—ও সব গল্প-কথা আমি শুনতে চাই না কালোদা... মি খেয়ে নাও...

কালো কহিল—খাবার ইচ্ছা আর নেই দিদি...ওঁদের দেখা অবধি মাতে আর আমি নেই···রান্না নেহাৎ চড়াতে হলো তোমার জন্ত...

—আমি কিছু খাবো না কালোদা। তুমি যদি সত্যি না খাও, তাহলে এসো আমার সঙ্গে···এখনি ষ্টেশনে যাই...

—মুখ-হাত ধোবে না...?

—না...

পুষ্পিতা তখনি কালোকে লইয়া ষ্টেশনে চলিল।

হাসপাতালে আসিয়া শুনিল, ছোট ছেলের দেহে প্রাণ এখনো আছে, তবে চব্বিশ ঘণ্টা না কাটিলে বলা যায় না। সদানন্দ বাবুর সম্বন্ধে প্রাণের আশঙ্কা নাই—তবে চোখে কিসের আঘাত লাগিয়াছে এবং সে বেশ গুরুতর আঘাত!

সে রাত্রে পুষ্পিতার ফেরা হইল না···মেডিকেল কলেজের কাছে এক হোটেলে গিয়া উঠিল।

বারবার মনে হইতেছিল—চোখের পলক-পাতে মানুষের এমন সর্ব্বনাশ ঘটে!

সর্ব্বনাশ সত্যই ঘটিল। ছোট ছেলেকেও বাঁচানো গেল না... সদানন্দ বাবু বাঁচিলেন···কিন্তু ডাক্তাররা বলিল—চোখ দুটি থাকিলে হয়!

পুষ্পিতা ডাকিল—কালোদা···

কালো কহিল—দিদি...

—সদানন্দ বাবুর বাড়ীতে আর কে আছেন ?

—দুই বিধবা বোন আর ভাগ্‌নে-ভাগ্‌নীর দল।

—তাঁরা কৈ হাসপাতালে এলেন না তো···

—তাঁরা যে হিঁদুর ঘরের বিধবা, দিদি—হাসপাতালে এ ম্লেচ্ছাচারে তাঁরা তো জাতধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারেন না।

—তুমি যাও কালোদা—গিয়ে তাঁদের বলো, আমি ডাক্তার বাবুদের সঙ্গে কথা কয়েছিলুম...ওঁরা বললেন, মাসখানেক হাসপাতালে রাখলে ভালো হয়...

কালো বলিল,—গিয়ে তাঁদের কি বলবো ?

পুষ্পিতা বলিল,—কেবিনের কথা বলো। কারো থাকা উচিত তো সঙ্গে...খাওয়া-দাওয়া, রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা করা...

কালো বলিল—তুমি বলচো,—বেশ, যাচ্ছি—কিন্তু ওঁদের যে রকম শুদ্ধাচারের কথা শুনি···ওঁরা ধর্ম্মের জন্য সদানন্দবাবুর প্রাণটুকুর মায়া অনায়াসে ত্যাগ করতে পারেন।

—আঃ, কি যে বলো কালোদা...মানুষের এমন বিপদে এ সব কথা বলছো কি করে !

—রাগ করো না দিদি। আমি যাচ্ছি...

কালো গেল। পুষ্পিতা ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কেবিনের ব্যবস্থা করিল...এবং সন্ধ্যা নাগাদ সদানন্দ বাবুকে কেবিনে আনা হইল। তাঁর খাশ বেয়ারা সাগর কাছে ছিল ; সে কেবিনে রহিল।

পরের দিন কালো আসিয়া সংবাদ দিল—তা'পরে, হিন্দু বিধবা...কত শুদ্ধাচারে ওঁদের থাকিতে হয় ; হাসপাতালে ওঁরা কি বলিয়া থাকিবেন ! বিশেষ এত বড় বিপদ গেল···শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা দরকার। দাদার জন্য তাঁরা বহু মানসিক করিয়াছেন...বাবাঠাকুর-তলায় নিত্য দুই

ন একশো আট বিল্বপত্র পাঠাইতেছেন, এবং দুই জনে তিন লক্ষ নাম করিতেছেন...

অগত্যা সেবার ভার লইল পুষ্পিতা। কালোকে বলিল—আমার ভিংস-ব্যাঙ্কের খাতাখানা এনো...আর টাকা তোলবার ফর্ম্ম। ানেক টাকা আপাততঃ তুলবো ..

সাগর ভৃত্য বলিল—সরকার মশাই কাল টাকা নিয়ে আসবেন...

পুষ্পিতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সদানন্দবাবু বলিলেন—কে?

—পু...

—আমি কোথায় আছি?

—হাসপাতালে।

—চোখে অন্ধকার দেখছি কেন?

—চোখে চোট লেগেছে। ওঁরা চোখ বেঁধে রেখেছেন। বললেন, ারে যাবে, ভয় নেই!

—হুঁ!...সেরে কি হবে ..জীবু-নীলু নেই...না?

জীবানন্দ-নীলানন্দ—দুই পুত্র।

পুষ্পিতা কোনো কথা কহিল না।

সদানন্দ বাবু কহিলেন—জানি, যাবে, থাকবে না। ...কেন, জানো ষ্পিতা?...আমার পাপে। ডাগর ছেলে...আমার মনে বাসনা হয়েছিল, তুন করে জীবন গড়বো...তোমাকে বিবাহ করবো। ভগবান ললেন ঐ ছেলে দুটো বাধা? বেশ, তাদের সরিয়ে নিচ্ছি...

পুষ্পিতা চোখের জল রোধ করিতে পারিল না...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তোমার অপমান করেছিলুম...

গাঢ় স্বরে পুষ্পিতা বলিল—আপনি ও-সব কথা বলবেন না...আমার কানো অপমান করেননি আপনি, বরং...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তুমি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলে···না? মনে-মনে?

পুষ্পিতা বলিল—না, না, আমি অভিশাপ দিইনি...দিইনি...আপনি জানেন...

সদানন্দ বাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কি একটা হচ্ছে...ক'দিন শুধু এটুকু বুঝেছি···আর কিছু নয়। ...শিব বাবুকে কেবলি দেখছি... তোমার বাবাকে···তিনি যেন দাবার ছক পেড়ে বসেছেন...

পুষ্পিতা বলিল—বেশী কথা বলবেন না...ডাক্তার মানা করেছে···

সদানন্দ বাবু দু'হাতে পুষ্পিতার হাত চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, —কথা বললে ভালো থাকবো...সত্যি...কিন্তু কি করে তুমি এখানে এলে?...আজ ক'দিন...

পুষ্পিতা জবাব দিল না। সদানন্দ বাবু কহিলেন—স্কুল-কামাই করে ঘর ছেড়ে এখানে আমার কাছে...আমি কোথাকার কে...

পুষ্পিতা কহিল—কেন এ-সব কথা বলছেন? বলবেন না।

—আর বলবো না পুষ্পিতা...কিন্তু এসেছো যদি, চলে যেয়ো না··· আমার আজ কেউ নাই...জীবু...নীলু...কেউ না। তুমি চলে গেলে একলা থাকতে পারবো না।

পুষ্পিতা বলিল—আমি চলে যাবো না।

—না। অন্তত আর যে কটা-দিন বেঁচে আছি...এ-যাত্রা আমি বাঁচবো না পুষ্পিতা, এ আমি বেশ বুঝচি ..বাঁচবার দরকার নেই···কেন বাঁচা? তবে হ্যাঁ,···একটা কাজ···

সদানন্দ বাবু চুপ করিলেন,—কি ভাবিতে লাগিলেন।

তার পর ডাকিলেন—পুষ্পিতা!

—বলুন...

—তোমার বাবার কাছে কথা দিয়েছিলুম তাঁর অন্তিমকালে⋯
তোমার দায়, তোমার ভার—তার ব্যবস্থা করতে দাও আমায়—
তাহলে ক'দিন পরে শিব বাবুর কাছে গিয়ে কি জবাব দেবো আমি ?

পুষ্পিতা কোন জবাব দিল না।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—স্কুলটা যদি তোমার হাতে দি—টাকা-কড়ি সব তোমার হাতে থাকবে...তুমি তো বিয়ে করবে না—এই যে সিভিলিয়ান—আমি জোর করতে পারি না। যতদিন বাঁচতে হবে, কারো মুখ চেয়ে না তোমায় থাক্‌তে হয়⋯ও স্কুলের একমাত্র ট্রাষ্টী হবে তুমি। তোমার হাতে সব টাকা-কড়ি থাকবে⋯তোমার খরচের জন্য মোটা টাকার ব্যবস্থা থাকবে...এটা আগে থেকেই ঠিক করেছি। যেদিন সেই সিভিলিয়ানকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে...কি জানো...

কথার শেষ নাই।

পুষ্পিতা শুনিতে লাগিল নিঃশব্দে। মুখে ছোট দু-একটা জবাব মাঝে মাঝে আসে—আর সেই সঙ্গে চোখে অবিরাম ধারা...

বারোদিন পরে চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন,—না, একেবারে অন্ধ হবেন না। তবে যে-দেখা দেখবেন, সে একেবারে অস্পষ্ট আবছায়া !

পুষ্পিতা কহিল—জীবন ?

ডাক্তার বলিলেন,—জীবনের আশঙ্কা নেই। আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই ! এত-বড় বিপদ ভগবান যখন ঘটালেন, তখন তা ভোগ করাবেন বৈ কি !

ছ'মাস পরের কথা।

পুরীর নীল-সায়র। বৈকালের দিকে সমুদ্র-তীরে ডেক-চেয়ার পাতা। চেয়ারে বসিয়া সদানন্দ বাবু।

চোখের সামনে আসমুদ্র পৃথিবী অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা। চোখের চিকিৎসায় ত্রুটি বা বিরাম নাই। বসিয়া বসিয়া সদানন্দবাবু অনেক কথা ভাবিতেছেন। নিজের জীবনের কথা···নিজের জীবনে স্ত্রী-পুত্রের জীবন আসিয়া মিশিল...কলরব-কোলাহলের জীবন্ত উচ্ছ্বাস জাগিল! তারপর বিদায়-বেলায় পাশে আসিলেন শিবশঙ্কর...আসিল পুষ্পিতা! ক্ষণেক মত্ততার ঘোরে শুষ্ক তরুতে মুঞ্জরিত পল্লবের স্বপ্ন জাগিল। তার পর বিভ্রম-মুক্তি। তারপর সেই নৌকায় চড়িয়া সংসারে বৈচিত্র্য-সম্পাদনের প্রয়াস! নৌকায় বসিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবেন ত্যাগের আনন্দে! মন আত্মহারা হইল। সহসা আকাশ ফাটিয়া বজ্রপাত...চেতনা-লোপ···

চেতনা ফিরিতে দেখেন, পৃথিবী অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে। যা কিছু ছিল, তার সব গিয়াছে। প্রাণটুকু কি করিয়া রহিল, বুঝিতে পারিলেন না!

তারপর সে অন্ধকার চিরিয়া আলোর ক্ষীণ রশ্মি! এ রশ্মি...

পুষ্পিতা কহিল,—আপনার চা...

সদানন্দ বাবু কহিলেন—আমার সেবায় নিজেকে তুমি হত্যা করতে বসেছো পুষ্পিতা!

পুষ্পিতা কহিল—আর তো কোনো কাজ নেই আমার। তাছাড়া আপনাকে কে দেখবে?

সদানন্দ বাবু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—তোমাকে কে দেখবে, সে কথা ভেবেচো?

—আমাকে দেখবার দরকার কারো নেই। আমার চোখ আছে। মানুষের যদি চোখ থাকে, তা হলে তার দুঃখ কি?

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—কিন্তু আর কত দিন তুমি এ দাস্য করবে? তোমার স্কুলের কাজ রয়েছে। এভাবে তোমায় আটকে রাখা উচিত হচ্ছে না।

পুষ্পিতা কহিল—এও আমার কর্ত্তব্য।

সদানন্দ বাবু কহিলেন—আজ বসে বসে ভাবছিলুম। ভেবে স্থির করেচি, আমার জন্য দুজন লোক রাখি। তারা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এমন লোক পাওয়া শক্ত হবে না। বহু বেকার লোক আছে ...কি বলো।

পুষ্পিতা কহিল—আপনার ইচ্ছা। আপনি যদি বলেন, আপনি চান না, আমি...

সদানন্দ বাবু কহিলেন,—না। তেমন ইচ্ছা আমার কখনো হবে না। তেমন ইচ্ছা হলে আমার জীবনে আর কি থাকবে, বলো! তা নয়, তবে আমার একটি সাধ আছে...

সদানন্দ বাবু চুপ করিলেন।

পুষ্পিতা বলিল—বলুন...

সদানন্দ বাবু বলিলেন—তুমি বিয়ে করো। এই একটি চিন্তায় আমি কাতর। আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। চোখ? এ চোখে অনেক-কিছু দেখেছি, অনেক-কিছু দেখিনি...চোখের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করবো

না—কিন্তু তুমি আজীবন এমন ভেসে বেড়াবে? না পুষ্পিতা। বাঙলা দেশের মেয়ের এ দুর্ভাগ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। সংসার...ছেলেমেয়ে...তোমার দেবার অনেক কিছু আছে। সেই সিভিলিয়ান...

পুষ্পিতা কহিল—সিভিলিয়ানের কথা আর আমায় বলবেন না...

সদানন্দ বাবু কহিলেন—কিন্তু তুমি বুঝচো না...

পুষ্পিতা কহিল—আমি বুঝি।

—কি বোঝো?

—বলবো। তার আগে আপনি চা খেয়ে নিন। চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সদানন্দ বাবু চা পান করিলেন।

চা পানের পর বলিলেন,—বলো...

পুষ্পিতা বসিল বালির উপরে; বলিল,—আমি বিয়ে করবো না।

—করবে না?

—না। আপনার সেবার কাজ করে আমাকে থাকতে দিন। কেবল মনে হয়, অনেক অপরাধ জড়ো হয়ে আছে...সে অপরাধের গ্লানি যতক্ষণে না ঘুচবে, আমার মন শান্তি পাবে না।

—অপরাধের গ্লানি? সদানন্দ বাবুর স্বরে বিস্ময়।

পুষ্পিতা নিশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া বলিল—তাই! আমি আপনার কাছে-কাছে থাকবো···আপনার অন্ধ চোখে দৃষ্টি হয়ে। তা ছাড়া আমার অন্য কামনা নেই।

সদানন্দ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন...কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন,—কিন্তু কত দিন এ কষ্ট ভোগ করতে হবে, তার ঠিক নেই··· পাগলামি করো না।

—পাগলামি নয়···যদি সারা জীবন এ কষ্ট ভোগ করতে হয়, কাতর হবো না...

—পুষ্পিতা...

পুষ্পিতা ভাঙ্গিয়া পড়িল...সদানন্দ বাবুর দু'পায়ে হাত রাখিয়া বলিল—একদিন আপনার যে বাসনায় প্রত্যাখ্যানের আঘাত দিয়েছিলুম ···আজ লজ্জা-সরম ত্যাগ করে নিজে থেকে বলছি, যদি বিবাহ করতে বলেন···তাতে যদি আপনি তৃপ্তি পান...

—পুষ্পিতা...

—না, আমার আপত্তি নেই। যদি বলেন, আপনি গ্রহণ করুন। সমাজের সামনে স্বীকার করি, আপনি আমার···

আবার সেই আকাশ-ফাটা বজ্রপাত...সদানন্দ বাবুর সর্ব্বশরীর অবশ···নিশ্চেতন···চেতনা ফিরিলে অনুভব করিলেন, পায়ের কাছে পুষ্পিতা মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

সদানন্দ বাবু তাকে তুলিলেন···বলিলেন,—কিন্তু দু'বছর আগেও মানুষ ছিলুম···এখন...আমাতে আর কি আছে...মনে যাতে তৃপ্তি পাবে!

পুষ্পিতা কহিল—না থাক, আমি চাই শুধু সেবার ভার! দু'বছর আগেকার চেয়ে এখনই আমাকে আপনার বেশী প্রয়োজন। আমি তা বুঝছি···আমার এ সাধ···

সদানন্দ বাবু কহিলেন—কিন্তু আমার মন এতে সায় দেবে না! একটা অন্ধ গলিত শব...

—ও কথা বলবেন না...যদি আমার সেবা আন্তরিক হয়, কোন দিন দুঃখ পাবেন না···এ-কথার প্রয়োজন হয়তো ছিল না। কিন্তু সমাজ···আমি সে কথা ভেবেছি! বাহিরের লোক ভুল বুঝে

আমার সেবা নিয়ে যদি কোনো দিন আপনার কুৎসা করে, সে আমার সহ্য হবে না! তাই সমাজকে বড় গলায় বলবো, স্বামী...স্বামীর সেবা করছি।

সদানন্দ বাবুর চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টির সামনে আলোর বিশাল দীপ্তি।

সদানন্দ বাবু বলিলেন—আকাশ লাল হয়েছে না?

—হ্যাঁ। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

—আমি তা হলে চোখে এখনো দেখতে পাই...দৃষ্টি লোপ পায় নি?

—না। ও চোখ সারবে।

—সারবে। তোমার এই ত্যাগের মন্ত্রে আমি দৃষ্টি ফিরে পাবো। কিন্তু যা বললে, তা হয় না। আমার সে দুর্বুদ্ধি সেরেছে—সে মোহ আর নেই। তা নয়, পুষ্পিতা। আমার ইচ্ছা, যোগ্য পাত্রকে তুমি বিবাহ করো। আমি সুখী হবো। বলো···আমার এ-কথা শুনবে?

পুষ্পিতা কহিল—শুনবো।

সদানন্দ বাবু কহিলেন,—এদিকে ত্যাগ-স্বীকার করছিলে...সেও না হয় হবে ত্যাগ-স্বীকার···কি বলো?

নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিতা বলিল,—বেশ!

সদানন্দ বাবু বলিলেন,—ঐ নীলাদ্রি বাবু...উনি সত্যই ভালো-বাসেন। ওঁকে ভুল বুঝো না। আমি তাঁকে বুঝেছি।

পুষ্পিতা বলিল,—আপনি যে-আদেশ করবেন, তাই হবে!

কলিকাতা পার্ক সার্কাসের দিকে চার-তলা ফ্লাটের উপর দু-কামরায় ঘরের বিছানায় পড়িয়া আছে বিজু।

হরকান্ত আসিয়া বলিল,—এই টাকাগুলো রাখো···একশো টাকা।

ঘরের ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছি। কারো দেনা নেই···আমি ফিরবো দশদিনের মধ্যে। তত দিনে তুমি দেহে বল পাবে। ফিরে এসে তোমায় নিয়ে বেরুবো কলম্বো কি ওয়ালটেয়ার—সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সুস্থ হবে।

হরকান্ত চলিয়া গেল। বিজু কোনো কথা বলিল না।

একটি মৃত শিশু...তার দেহ-মন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

হরকান্ত বলিয়াছিল, সে বিবাহ করিবে···শুধু দু'চারিটা বৈষয়িক ব্যবস্থা···তার মধ্যে অসহায় শিশুর আগমনী বাজিল...

লোকের চোখে তীব্র দৃষ্টি! সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া একান্তে এই ফ্লাটে আসিয়া দুজনে উঠিয়াছিল···হরকান্ত ভয়ে কাঁটা...লজ্জায় বিজু নিশ্চেতন!

সে কাঁটা আজ আর নাই...তাহার মূল ছিন্ন হইয়াছে···

বিছানায় পড়িয়া বিজু ভাবিতেছিল, মা-বাপের কথা...শুভেন্দুর কথা...

বাড়ীর পর বাড়ী। এই ফ্লাটে অসংখ্য ঘর। সব ঘরে প্রেমের স্নিগ্ধ শান্তি। তার মত দুর্গতি কে ভোগ করিতেছে?

হরকান্ত যদি আর না ফিরিয়া আসে?

বিজু কি করিতে পারে? মধুপিয়াসী বিবেকহীন, বিবেচনাহীন স্বার্থপর নীচ...কিন্তু হরকান্তকেই বা কেন সে তিরস্কার করে? সে নিজে কি চাহিয়াছিল? এমন করিয়া তুচ্ছ ভাবিয়া যে লোক নিজেকে সকলের পায়ের তলায় ফেলিয়া দিতে পারে, তাকে যদি পথের লোক পা দিয়া মাড়াইয়া আহত জর্জ্জরিত করিয়া চলিয়া যায় তো সে কার অপরাধ? পথিকের? না তার নিজের?

কণ্টক-শয্যায় বিজুর পনেরো দিন কাটিল।

এখানকার বাতাস সেই সব স্মৃতির বিষে বিষাইয়া আছে। প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে।

এখানে আর নয়। হরকান্তরও কোনো সংবাদ নাই। বিজু ভাবিল, ইহাই ঘটে। বইয়ে পড়িয়াছে সংসারে দেখিয়াছে। তবে...

রাত্রি প্রায় বারোটা। চোখে ঘুম নাই...মনে আগুনের জ্বালা... বিজু উঠিল। টলিতে টলিতে নামিয়া বাড়ীর বাহিরে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর চলিল যে দিকে ছ'চোখ যায়, সেই দিকে। শঙ্কাহীন উদ্দেশ্যহীন গতি। একটা মোড়ের মাথা। মোটর আসিতেছিল ...ভয়ঙ্কর বেগ...আলোর তীব্র জ্যোতি, যেন এক দৈত্য হুহুঙ্কারে তাড়া করিতেছে!

কোথায় পালাইব? বিজুর মাথা ঘুরিতেছিল। সহসা ভীষণ বেগে পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের ধাক্কা লাগিল। বিজু পড়িয়া গেল; রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া তাকে কোন পাতালে নামাইয়া লইয়া চলিল...

২৯

হাসপাতালে দেড় মাস পরে।

নার্স আসিয়া বলিল—আপনার লোক এসেছেন। গাড়ী এনেছেন বাড়ী নিয়ে যাবার জন্ম।

বিজু অবাক! তার লোক আসিয়াছে তাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্ম? কে এমন লোক?

মা? বাবা? ভাই-বোন?

আজো তারা বিজুকে মনে রাখিয়াছে? আশ্চর্য্য!

সে লোকের সঙ্গে দেখা বাহিরের বারান্দায়....

লোক বলিল—নমস্কার।

বিজু অবাক!

লোক বলিল—আমার মোটরের ধাক্কায় আপনার এ দুর্ভোগ...কিন্তু আমার কোনো অপরাধ ছিল না। আপনি ছিলেন দূরে ফুটপাথে... হঠাৎ ছুটে কেন যে মোটরের সামনে এসে পড়লেন...ব্রেক কষতে সময় পেলুম না!

বিজুর মনে পড়িল, তাই বটে! দুটো আলোর চোখ—যেন দৈত্য আসিতেছিল তাকে বাঁধিতে! ভয়ে পলাইবে বলিয়া সে ছুটিয়াছিল—তারপর আকাশ নামিয়া আসিল সশব্দে পৃথিবীর বুকে! এবং তার পর সব অন্ধকার...

লোকটি বলিল—আপনার বাড়ী কোথায়?

—বাড়ী নেই।

—লোকজন?

—কেউ নেই।

লোকটির বিস্ময় সীমাহীন। লোক বলিল—আমার বাড়ীতে আসুন তবে। সেখানে আছেন আমার বুড়ো মা…আর কেউ নেই।

—কিন্তু…

—কিন্তু কিসের?

বিজু বলিল—কোনো বাড়ীতে আমার যাবার উপায় নেই।

—উপায় নেই!

—না। আমার মান নেই, ইজ্জৎ নেই, কিছু নেই…। সংসারে আমার স্থান হতে পারে না। আপনার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করবো, সে অধিকারও আমার নেই।

লোকটির দু'চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ।

বিজু বলিল—আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি…আমি…আমার লজ্জা হচ্ছে আমার নিজের পরিচয় দিতে। যার চেয়ে দোষ মেয়েমানুষের আর হতে পারে না…মানে…

লোকটি বলিল—বুঝেছি। আপনার ছবি কাগজে দেখেছি, আপনি শ্রীমতী বিজলী…

—থাক্…আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

লোকটি বলিল—আমাকে খুব সাধু ভাববেন না…জীবনে বহু অন্যায় করেই বেড়িয়েছি চিরদিন এবং আমার মা চিরদিন আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং ক্ষমা করছেন বলেই আমি আমার জীবনকে নতুন করে গড়তে পেরেছি। কোনো ভয় নেই…আসুন আমার মার কাছে…তিনি পাপকে ঘৃণা করেন…পাপীকে ঘৃণা করেন না।…তিনি সত্যকার মা… দোষী সন্তানকে সন্তান বলেই বুকে নেন।

বিজুকে যাইতে হইল…এবং আশ্রয় মিলিল।